বিনিময় ২০ টাকা

অধিকার

বিশেষ লক-ডাউন সংখ্যা (মার্চ-মে, ২০২০)

এই সংখ্যার বিষয়

সম্পাদকীয়
লক-ডাউন : বিরামহীন অধিকারহরণ
লক-ডাউন কিংবা বিপর্যয়: প্রতিহিংসার রাজনীতি ও গ্রেপ্তারি চলছেই
লক-ডাউন এবং বলির পাঁঠা "পরিযায়ী শ্রমিক"
তথ্যানুসন্ধান : তেলিনিপাড়া, দমদম জেল, আমফান
ঘটনাপ্রবাহ
সভ্যতার সঙ্কট ও শ্রমিকশ্রেণি
লক-ডাউন: বিক্ষোভ এবং পুলিশের লাঠিচার্জ ও নির্যাতন
করোনা-সঙ্কটে জেলখানা এবং বন্দির অধিকার
অতিথি শ্রমিকদের মণিদ্বীপ
সংগঠন সংবাদ
জাতীয় চালচিত্র
শ্রমিকের সর্বনাশ
প্রেস বিবৃতি

সম্পাদনা: পত্রিকা উপসমতি। গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত (8981416511) কর্তৃক প্রকাশিত ও কলাভবন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

বিপর্যয় মোকাবিলার নামে মানবাধিকারের বিপর্যয়কে রুখতে হবে

ভারত আজ দুরকম বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যার একটির উৎস করোনা মহামারি, আর একটির কারণ হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির এই মহামারির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আবার আর একটি খাঁড়ার ঘা এসে পড়ল — সাইক্লোন আমফান। এক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম, দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হলেন। প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে উড়তে উড়তে সেই দুর্দশা দেখলেন। তারপর দিল্লি থেকে এল ১,০০০ কোটি টাকার নাম-কা-ওয়াস্তে প্রতিশ্রুতি, নবান্ন থেকে গাছ কাটতে ডাকা হল সেনা, অধিকাংশ জায়গায় জলমগ্ন, বিদ্যুৎহীন, খাদ্যহীন, গৃহহীন মানুষের অবস্থা একই রয়ে গেল।

বিপদ নাকি জানিয়ে আসে না। অথচ, এই মহামারি আর সাইক্লোন, দুটোই জানিয়েই এসেছে।

প্রথম ক্ষেত্রে যখন খবর পাওয়া যাচ্ছিল, করোনা ভাইরাস ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে, তখনও অনেক দিন পর্যন্ত কেন্দ্রের শাসক দল রাজনীতির খেলাতেই ব্যস্ত ছিল। আপৎকালীন প্রস্তুতির কোনও বালাই ছিল না। এর বহু আগে থেকেই জনস্বাস্থ্যকে মানুষের অধিকার হিসেবে না দেখে বাজারের পণ্য হিসেবে দেখা হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে সরকার প্রায় হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ফলে বিপদটা ঘরে ঢুকে পড়ল যখন, আর কোনও প্রতিরোধী পদক্ষেপই নেওয়া গেল না। বরং, গত আড়াই মাস ধরে একটার পর একটা এলোমেলো কথা বলা হয়েছে। একদিন ঘরবন্দি থেকে ঘণ্টা বাজালেই সংক্রমণের সুতো ছিঁড়ে যাবে, ২১ দিন লক-ডাউন, ৪৯ দিন লক-ডাউন, ৭০ দিন লক-ডাউন, সমস্ত কিছু করেও যখন কুলকিনারা পাওয়া গেল না, তখন আবার উলটো পথে হেঁটে এক-এক করে সব খুলে দেওয়া হল — এবারেও এর ফল কী হতে পারে তা স্পষ্ট করে না বলেই, সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার মত প্রস্তুতি না নিয়েই।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ প্রথম চিনের উহানে লক্ষ করা যায় ২০১৯-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে। ভারতে প্রথম আক্রমণ ৩০ জানুয়ারি। মার্চ মাসে ভারতের পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছিল। অধিবেশন শেষ হতে যখন তিন দিন বাকি তখন হঠাৎ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়। সেই সময়ে কেন্দ্রের শাসক দল এমএলএ কেনাবেচার মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশে তার বিরোধীপক্ষের সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করছিল। তার জন্য আরও কয়েক দিন দেরি করা হয়। এটা স্পষ্ট যে দীর্ঘ তিন মাস আগে যে ভাইরাসের সমস্যা পৃথিবীর সামনে এসেছে তা নিয়ে সংসদে আলোচনার এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তা একেবারেই না করে, এমনকি ভারতের মহামারি নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞ, ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অথবা চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিএমআর-এর সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করে হঠাৎই দেশজুড়ে এক অভিনব 'জনতা কারফিউ' জারি করা হয়। জারি করার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী আবেদন বা অনুরোধের ঢঙে বললেও কার্যত সেটা সরকারি নির্দেশে জারি করা কারফিউতে পরিণত হল।

জনতা কারফিউ শেষ হতে না হতেই মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে ঘোষণা করা হল দেশজোড়া লক-ডাউন, কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই। যখন ভারতের সর্বত্র নয়, কয়েকটি স্থানে ভাইরাসের আক্রমণ দেখা যাচ্ছে, এই অবস্থায় সারা দেশে লক-ডাউন ঘোষণা করে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্দশায় ফেলা হল। সাড়ে তিন কোটি থেকে পাঁচ কোটির মত মানুষ, যাঁরা নিজেদের রাজ্য থেকে বহুদূরে গিয়ে বিভিন্ন শহরে, শিল্পাঞ্চলে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন, তাঁরা বাসস্থান থেকে কয়েক শ' থেকে দু'হাজার কিলোমিটার দূরে আটকা পড়ে রইলেন। তারপর শুরু হল তাঁদের ঘরে ফেরার বেপরোয়া চেষ্টা — পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, ট্রাকে, এমনকি কংক্রিটের মিক্সারের ভেতরে ঢুকে — যাতে প্রাণ গেল অনেকের, যে কথা আজ কারও জানতে বাকি নেই। শেষপর্যন্ত তাদের জন্য কয়েকটা ট্রেন চালু হল বটে, কিন্তু তাও আবার বিনা পয়সায় নয়। যারা পারলেন কোনওরকমভাবে টিকিট কেটে চড়ে বসলেন। অনেকেরই আর রুটি-রুজি হারিয়ে ভাড়া দেওয়ার মত সামর্থ্য ছিল না। তাঁদের ভাড়া গন্তব্য রাজ্যের সরকারগুলিকেই মেটাতে বলা হল, এবং তাই নিয়েও চলল রাজনৈতিক চাপান-উতোর। এর মাঝখানে সেই মরিয়া যাত্রা চলতেই থাকল, আর তার সঙ্গে বেড়ে চলল মৃত্যু-মিছিল।

এরাজ্যে ভয়ঙ্কর সাইক্লোন যে আসছে, তারও পূর্বাভাস আবহাওয়াবিদরা দিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন আগেই। দেশে 'ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট' (**ডিএমএ**) বা বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে দুটো বিধ্বংসী সাইক্লোন এসেছে — আইলা এবং বুলবুল, কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে ফনি। আইলায় যাদের ঘর ভেঙেছিল, বুলবুলে আবার তাদের ঘর ভেঙেছে, আর আমফান আরও বেশি শক্তিশালী বলে আরও বেশি লোকের ঘর ভেঙেছে। এত বছরেও বাঁধগুলো পাকাপোক্ত হল না, আবার সেগুলো ভেঙে গিয়ে জল ঢুকেছে হু হু করে, ভাসিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। প্রস্তুতির জন্য আর কত সময় দেবে প্রকৃতি? ঝড় চলে যাওয়ার পড়েও মানুষের দুর্দশা এতদিন চলেছে যে বোঝাই গেছে, বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ-টিয়ন্ত্রন আসলে কথার কথা, এসবের কোনও প্রস্তুতিই নেই, আর থাকলেও তা দুর্গত মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছনোর কোনও ব্যব্যস্থাই করা হয়নি।

জনস্বাস্থ্যের মত বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিষেবার ওপরেও জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করে তাকে ব্যবসা করার মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছিল অনেক আগেই। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বা সিইএসসি-কে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ডিক্রি জারি করে গোয়েঙ্কাদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের একচেটিয়া ঠিকা দিয়েছিল। তারপর থেকে বিদ্যুতের দাম তারা বাড়িয়েই চলেছে, কিন্তু একটি জন পরিষেবা ব্যবস্থায় যে আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মত আয়োজন রাখতে হয়, তার জন্য যে টাকা খরচ করার দরকার ছিল, তার কাছাকাছিও করেনি মুনাফাখোররা। তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন আমফানের পর দিনের পর দিন শহরের ব্যাপক অঞ্চল বিদ্যুৎহীন, এবং তার পরিণামে নিত্যব্যবহার্য জল ও অন্যান্য পরিষেবাহীন হয়ে রইল, নাগরিকদের এই সাধারণ ন্যায্য পাওনাটুকুও আদায় করবার জন্য রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে হল, তখন। আবার, 'প্রাইভেট সেক্টারের' গাফিলতির দোহাই দিয়ে সরকারি ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হাত তুলে দিল। নিজেদের অপ্রস্তুত অবস্থার জন্য কোনও কৈফিয়ত দেওয়ার দায় অনুভব করল না।

অথচ, এই করোনা মহামারির সময়ে আমরা দেখলাম, ডিএমএ-এর সেই সব সংস্থানগুলিকেই কার্যকর করা হচ্ছে, যাতে সরকারের হাতে প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব থাকে। মানুষের সহায়তার ধারাগুলি উপেক্ষিত। করোনাভাইরাসকে প্রতিহত করার জন্য যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেগুলি সবই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। পার্লামেন্ট ও সমস্ত নির্বাচিত সংস্থা ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অকেজো করে দিয়ে। বস্তুত, কেন্দ্রীয় স্তরে এখন কয়েকজন মন্ত্রী আর ন্যাশনাল ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিএমএ)-র কয়েকজন আমলা মিলে দেশ চালাচ্ছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক সংস্থাকে কার্যত শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে, গণ-তদারকির কোনও সুযোগ নেই।

অন্যদিকে, যেরকম তৎপরতা নিয়ে এই বিপর্যয়ের মধ্যেও একের পর এক গণ-আন্দোলনের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা চলছে,

তা দেখে মনে হয়, সরকার যেন এই সুযোগের জন্য ওত পেতেই ছিল — 'একবার লক-ডাউনটা হোক না, তারপর দেখিয়ে দেব, সিএএ, এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফল কী হতে পারে।' 'সামাজিক দূরত্বের' জুজু দেখিয়ে সব প্রতিবাদের মুখও বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। লক-ডাউন বস্তুত কার্ফিউতে পরিণত হয়েছে, পুলিশকে দেওয়া হয়েছে বেআইনী নিপীড়নের ক্ষমতা। রেশন, বিদ্যুৎ, জলের দাবি করতে গিয়েও মানুষকে মার খেতে হয়েছে, জেলে যেতে হয়েছে, যার মধ্যে এপিডিআর-এর কর্মীরাও আছেন। আর তার সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর সব দোষ চাপিয়ে, তাদের প্রতি ঘৃণা-ছড়ানো প্রচার তো চলছেই।

মানুষের জীবনের প্রতি সরকারের চরম অবহেলা এবং অশ্রদ্ধা দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। আমরা এও লক্ষ করেছি যে, করোনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রাণ প্যাকেজের নামে যা ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে আয়-হারানো মানুষদের হাতে দুটো পয়সা আসার মত সংস্থান সামান্যই রয়েছে, এর বেশিরভাগটাই নানারকম ঋণের গল্প। আর এই সুযোগে ঢালাও বেসসকারিকরণ, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের মত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিকে পুঁজিপতিদের কাছে বেচে দেওয়া, শ্রমিকদের দীর্ঘ লড়াইতে অর্জিত বেশিরভাগ অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং পরিবেশ রক্ষা আইনকে কার্যত শিকেয় তুলে দেওয়ার মত কয়েকটি মারাত্মক ঘোষণাও করা হয়েছে।

এপিডিআর এই সমস্ত জনবিরোধী পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে। আমরা দাবি করছি, বিপর্যয় মোকাবিলার নীতি ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাকে জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার হাতিয়ারে পরিণত করা চলবে না, জনগণকে সাথে নিয়েই বিপর্যয় মোকাবিলার সঠিক পথে চলতে হবে। এজন্য পার্লামেন্ট সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে এড়িয়ে না গিয়ে তার মধ্যে যেমন ব্যাপক আলোচনা করতে হবে, তেমনি শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন, অধিকার সংগঠন সহ গণ-সংগঠনগুলির সঙ্গেও আলোচনা চালাতে হবে। মানুষকে জড়িয়ে নিয়ে কাজ না করলে ভবিষ্যতেও কোনও মানবিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

এপিডিআর-এর সভাপতি সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

১৪ মে জীবনাবসান হল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)-এর সভাপতি সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

গত শতাব্দীর চারের দশক থেকে গণ-আন্দোলনে দীর্ঘ পথ হেঁটেছেন সহযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। নেতার দূরত্বে চলে যাননি। তাই তরুণতম সহকর্মীর কাছেও অনায়াসে হয়ে উঠতে পেরেছিলেন প্রিয় 'শচীদা'। ছাত্র আন্দোলন দিয়ে শুরু, স্কুলজীবনেই জেলে যান। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদও পান কারারুদ্ধ অবস্থায়। দাদাও জেলে গিয়েছিলেন। আর মা মনোরমা বন্দিমুক্তি আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন আরও অসংখ্য ছেলেমেয়েকে স্বাধীন দেশের গারদ থেকে বের করে আনতে।

হুগলি জেলায় উত্তরপাড়া-শ্রীরামপুরে পার্টির কাজ করতেন। অচিরেই সান্নিধ্যে আসেন মুজফফর আহমেদ, সুশীতল রায়চৌধুরীদের। এনবিএ-র দায়িত্ব পান। পরে হরিপালের স্কুলে পড়িয়েছেন কিছু দিন। শেষে রেলের কো-অপারেটিভে চাকরি, সঙ্গে ইউনিয়নের দায়িত্বও। পার্টি ভাগের পর সুশীতল রায়চৌধুরীর সঙ্গে নকশালবাড়ির পথেও হেঁটেছেন। আবার মতপার্থক্যে সরেও এসেছেন।

জরুরি অবস্থার আগেই এপিডিআর-এর সঙ্গে যোগাযোগ বন্দিমুক্তি আন্দোলনের সূত্রে। সাড়ে চার দশকেরও বেশি নিরবচ্ছিন্ন থেকেছে সে সম্পর্ক। রেলের ইউনিয়ন ও এপিডিআর-এর কাজের সূত্রেই বেশি বয়সে আইন পড়েছেন। সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা ও আদায়ে আইনি লড়াই করেছেন। গণ-আন্দোলনে বরাবরই ছিলেন আপসহীন। নীতির প্রশ্নে দৃঢ়, আবার পরমতসহিষ্ণু। সহমতের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। শেষ দু'দশক ধরে ছিলেন এপিডিআর-এর সভাপতি। বহু দিনই হুগলি ছেড়ে বাসা গড়েছিলেন বারুইপুরে। ৮৮ বছর বয়সে শরীরটা আর সঙ্গ দিচ্ছিল না। বৃস্পতিবার দুপুরে সরে গেল বনস্পতির ছায়াটা।

এপিডিআর হারাল বহু যুদ্ধের সাথীকে।

লক-ডাউন : বিরামহীন অধিকারহরণ

সুজাত ভদ্র

আমরা সত্যিকারের মহা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। কার্যত গৃহবন্দি হয়ে টিভির পর্দায় নজর রাখছি অথবা সংবাদপত্রে টুকরো টুকরো খবর যখন পড়ছি, তখনই এক অকল্পনীয় ভারতের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমরা পড়েছি, "জাতির জনকের" পদব্রজে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়ার ইতিহাস। চীনের মাও দের লং মার্চ। সেই সব এপিক যাত্রার সাথে চলিষ্ণু অনাহার ক্লিষ্ট পুরুষ—নারী—শিশু নির্বিশেষে আমাদের সহ নাগরিকদের হাজার কিলোমিটার হেঁটে চলার কোনও মিল নেই। শিশুকে নিয়ে মা,মাথায় ব্যাগপত্র নিয়ে পুরুষেরা, টলমল পায়ে শিশুরা হাঁটছেন; লক্ষ্য একটাই: ঘরে পৌঁছনো। এ দৃশ্য আমাদের চেতনাকে, বিবেককে, মনুষ্যত্বকে তীব্রভাবে আঘাত করছে। মানবতার এই চরম অপমান সমস্ত অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়ার কাঠামো টাকেই ধ্বংস করছে। অন্যদিকে, বন্দে মিশন এর মধ্য দিয়ে যারা বিদেশ থেকে দেশে আসছেন, তারা পাঁচতারা হোটেলে উঠছেন, করোনা এর পরীক্ষা হচ্ছে, মিডিয়ায় ফটো উঠছে, এলাকায় অভিনন্দিত হচ্ছেন। গ্রামে ফিরে জিডিপি বাড়ানোর কারিগররা জানেন না, এবার তারা খাবেন কী?

একাধিক সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, লক-ডাউনের আগেই পরিযায়ী শ্রমিকের মজুরি বাকি ছিল। লক-ডাউনের সরকারি নির্দেশনামা থাকা সত্বেও মালিকরা, ঠিকাদাররা কোনও মজুরি দিল না। কপর্দকশূন্য হাজার লক্ষ মানুষ চাকরি হারিয়ে,যৎসামান্য সঞ্চয়টুকুও লক-ডাউন এ খরচ করতে বাধ্য হয়েছে। সরকার - মালিক - ঠিকাদারের চরম উদাসীনতা, হৃদয়হীন আচরণ বাধ্য করলো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাঁটা। মালগাড়ি ঘুমন্ত শ্রমিকদের পিষে দিচ্ছে। ট্রাক উল্টে গর্ভবতী মা সহ বহু শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। ট্রেনে চাপতে না পেরে শ্রমিক আত্মহত্যা করে। তবু এই enduring injustice, caravan of endless misery-কে উপেক্ষা করেই তাঁরা আজও হাঁটছেন। তাহাদের জন্য চমক নেই, মিডিয়ার উপছে পড়া ভিড় নেই, আছে শুধু নেতাদের টুইটার এ রুদালির কান্না, আছে অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যাচার।

ব্রিটিশ আমলের মহামারী আইন হোক, ২০০৫ সালের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা আইনই হোক, তা চরিত্রে সে সাদাই হোক, বা কালোই হোক, তাকে ভ্রুক্ষেপ না করেই শ্রমজীবী মানুষের এই জনস্রোত, ইতিহাসের পরিভাষায়, "বিদ্রোহ"; বোমা বন্দুকের চাঞ্চল্যকর বিদ্রোহ নয়। নীরব বিদ্রোহ, "re-volt by default"! রাষ্ট্রের নিয়ম কানুন, দড়ি দরা, রক্তচক্ষু কে, অনুরোধ উপরোধ কে উপেক্ষা করেই নিঃশব্দে পদব্রজে নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া টাই তো ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতি স্পর্ধা দেখানো। মধ্য বিত্ত, ধনী সুসভ্য সমাজ বিনা প্রশ্নে যেখানে রাষ্ট্রিয় অনুশাসনের অত্যাচারকে মেনে নিয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনার দু দুটো তীক্ষ্ণ বিবৃতিতে বললেন, পরিযায়ী শ্রমিকের চূড়ান্ত হয়রানি হচ্ছে। মহিলা শিশুরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ১১ মে পঞ্চম তম সভায় যখন প্রধানমন্ত্রী তথাকথিত গ্লোবাল প্রশংসার কথা বলছেন, তখন একজন মুখ্যমন্ত্রীও বললেন না রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই সমালোচনার কথা। সুপ্রিম কোর্টে হর্ষ।মন্দার রা আবেদন করে এপ্রিল মাসেই বললেন,হস্তক্ষেপ করুন, জীবন জীবিকার সংকটে আজ কয়েক হাজার লক্ষ ভারতীয় নাগরিক। বললেন, করোনা তাদের সৃষ্ট নয়। তাঁরা দায়ী নন।রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সব ধরনের সুরক্ষা দেওয়া। কাকস্য পরিবেদনা! আদালত তাঁদের কুখ্যাত "doctrine of evasion"কেই এখানেও প্রয়োগ করলেন।

নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক আবেদনগুলো আদালত হৃদয়হীন ভারত সরকারের কোর্টে পাঠিয়ে দিলেন। যে সরকার লাঠিয়াল এর লাঠি ছাড়া আর কোনো কিছুই বোঝে না, শ্রমিক দের ঘরে ফেরার জন্য ব্যবসায়িক হিসাব কষে, ট্রেনের ভাড়া আদায় করতে সামান্যতম লজ্জা, কুণ্ঠা বোধ করে না, পি এম কেয়ার এর নামে লক্ষ কোটি অনুদান তোলে, তাদের কাছে বিরাট মানবিক আচরণ প্রত্যাশা করলেন সুপ্রিম কোর্ট! প্রাক্তন বিচারপতি এ পি শাহ বললেন, সুপ্রীম কোর্ট তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষ আজ মৃত্যুর কিনারায়। রুপালি রেখা আছে। অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ, গুজরাট সহ দেশের ১২ টি হাই কোর্ট পরিযায়ী শ্রমিকের জীবন ও জীবকার অধিকার সুরক্ষায় হস্তক্ষেপ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় শাসক দলের হুংকার, আইনের কার্ডকে উপেক্ষা করেই,কেরালা সরকার, নাগরিক, স্বাস্থ্য সংগঠন, সবাই মিলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো যে, ভয়ংকর ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব, আপামর মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব জন স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে, বিপরীতে, কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসক দল প্রথম থেকেই চূড়ান্ত মিথ্যাচার শুরু

করলো, এবং আজও করে যাচ্ছে। বড়ো বড়ো বিবৃতি, চমক লাগানো ঘটনা ঘটানো (ঢাক ঢোল, কাসর বাজানো, মোমবাতি জ্বালানো, বিমান থেকে পুষ্প বৃষ্টি ইত্যাদি) হয়তো ভোটের কাজে লাগতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে করোনা পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। লক-ডাউনের ৪১দিনের মাথায় সুপ্রিম কোর্ট কে ভারত সরকার জানালো, রাস্তায়, জনপদে, কোনও পরিযায়ী শ্রমিক নেই, তারা সবাই নিরাপদ শেল্টারে আছেন, নিয়মিত পর্যাপ্ত খাদ্যও পাচ্ছেন!! দিনদুপুরে ডাকাতির মত। সরকারের তরফে একজন ডাক্তার পাল পি পি পি দিয়ে বললেন দ্বিতীয় পর্যায়ের লক-ডাউনের সময়ে যে, ৩মে এর পর আর করোনা আক্রান্ত কেউ থাকবেন না অথচ রোজ পজিটিভ রেখ উর্ধমুখী। ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ভারতবাসীকে জানালেন, বিদেশ থেকে আগত সমস্ত যাত্রীকে সব বিমানবন্দরে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বাস্তবে? শুধুমাত্র তিনটি বিমানবন্দরে ও শুধুমাত্র চিন এবং হংকং থেকে আগত যাত্রীদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। ততক্ষণে কিন্তু ২০টি দেশ ঘোষিত ভাবে আক্রান্ত।

এপ্রিল মাসেই নানা মহল থেকে ভারত সরকার কে বলা হয়েছিল, শুধু লক-ডাউন নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক নানা পদক্ষেপ করা উচিত, মানুষের মধ্যে খাদ্যের সুষম বণ্টন ব্যবস্থা করা উচিত, উন্নত মানের শেল্টারের বন্দোবস্ত করা উচিত। অপরিকল্পিতভাবে, দায়িত্বজ্ঞান হীন ভাবে লক-ডাউন ঘোষণার পরে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার চেষ্টার বদলে মিথ্যাচার চলতে থাকল। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য নভিত উইগ সরকারি সভাতেই ২৯ এপ্রিল সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, আর মিথ্যা বলবেন না। সত্য বলুন ভারতবাসীকে! তাতো বলাই হলো না, এমনকি ২১ সদ্যসের টাস্ক ফোর্সের উপদেশ,সুপারিশ অগ্রাহ্য করেই ১ মে লক-ডাউন বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এই সরকারের আরেকটি কৌশল প্রণিধানযোগ্য। কোনও বিষয়ে বিদেশি প্রশংসা পেলেই নিজ অনুকূলে সোচ্চারে ব্যবহার করে। কিন্তু বিদেশ বা স্বদেশ থেকে কোনও গঠনমূলক সমালোচনা পেলেও তাকে ভিত্তিহীন, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বলে খারিজ করে দেওয়া। তখন অস্বীকারের রাজনীতির আশ্রয় নেয়।

সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার হলো,।করোনা ভাইরাস কে হাতিয়ার করে, নির্দিষ্ট জরুরি ক্ষমতাকে স্বেচ্ছাচার ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে নানা ভাবে। কাশ্মীরে ডোমিনিয়ন অর্ডিন্যান্স জারি করার চেষ্টা, প্রবল প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে জম্মু কাশ্মীরের ব্যাংক প্রধান পদে কাশ্মীরের বাইরের লোককে নিয়োগ করা, দিল্লির তবলিগ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিদ্বেষ চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাওয়া, দিনের পর দিন বেআইনি ভাবে বন্দি করে রাখা ৫ হাজার মানুষকে, যা মিডিয়ার দৌলতে নতুন নর্মাল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে মান্যতা পেয়েছে। আরো লক্ষনীয়, করোনা পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করেই গৌতম নাভলাখা, আনন্দ তুলথাম্বে কে এন আই এ দিয়ে গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক বন্দীদের জেল থেকে মুক্তি না দেওয়া, অরুণ ফেরেরা সহ বাকি দের চার্জশিট এর কপি জেলে নিজেদের জিম্মায় রাখতে না দেওয়া এক চরম মৌলিক আইনের শাসন বিরোধী। কবি ভারাভারা রাও আশির বেশি বয়স হওয়া সত্বেও মুক্তি না দেওয়া মানবতাবিরোধী কাজ। ১২মে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক পরিবেশের খর্বতা নিয়ে একটা বাক্য ব্যয় করলেন না। যেন বিলকুল সব ঠিক আছে।

করোনা ভাইরাস এর আবহে কেন্দ্রীয় সরকার আক্রমণ নামিয়ে এনেছে কাশ্মীরের মহিলা সাংবাদিকের উপর, গ্রেপ্তার করেছে বিরোধী মহিলা অন্তঃসত্বা আন্দোলনকারীকে। ওমর খালিদের বিরুদ্ধে দিল্লি প্রোগ্রাম কে ব্যবহার করে ইউ এ পি এ তে এফআই আর দায়ের করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে, লক-ডাউন ভাঙার অজুহাতে পুলিশের নানা ধরনের বেআইনি অত্যাচার নিয়ে সরকারি কমিশন গুলোও নীরব।পশ্চিমবঙ্গে রেশন ঘিরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে পুলিশ দিয়ে দমন করা হচ্ছে। আরো উদ্বেগজনক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। উদ্বৃত্ত খাদ্য গরিবিতম মানুষের মধ্যে বণ্টন না করে তা দিয়ে এথানোল প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৪ সালের পর ক্ষুধা সূচকে ভারত অনেক ধাপ নেমে গেছে। চোখে গরীব, পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য কান্না, আর বাস্তবে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে ভারত সরকার।

এর অর্থ এই নয় যে, পরিযায়ী শ্রমিকের অবস্থা প্রাক - লক-ডাউন পর্বে ভালো ছিল। রাধিকা জৈন দেখিয়েছেন, বছরের পর বছর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর পরিযায়ী শ্রমিক দের প্রতি চরম উদাসীনতা ও অবহেলা দেখিয়ে আসছে। ১৯৬০এর দশকে মুম্বাই এ "মারাঠি মানুষ" আন্দোলন থেকে শুরু করে ২০১২ সালের ব্যাঙ্গালোরে উত্তর পূর্বাঞ্চল শ্রমিক দের বিতাড়নের আন্দোলন আমাদের স্মরণ আছে। স্থানীয়দের "পরিযায়ী শ্রমিক দের প্রতি ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা ভুরি ভুরি উদাহরণের সাথে আমরা পরিচিত। কমন কজ এবং সিএসডিএস এর ২০১৮সালের ২২রাজ্যের পুলিশ পরিযায়ী শ্রমিকের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করে তা নিয়ে সমীক্ষা করে। সেই রিপোর্ট দেখাচ্ছে, পুলিশ নগ্নভাবে পরিযায়ী শ্রমিকের সাথে বৈষম্যমূলক।আচরণ করে।সরকারগুলো উদাসীন। ২০১৯ সালে সাতটা রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক বান্ধব নীতি কতখানি তা নিয়ে একটা তুলনামূলক বিশেষণ করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য, গৃহ, স্যানিটেশন, সামাজিক সুরক্ষা,শিশুদের অধিকার, শিক্ষা ইত্যাদি মানদণ্ডের নিরিখে কেরালা অনেক এগিয়ে।দিল্লি সবার পেছনে। সুতরাং আর্থ সামাজিক বৈষম্য টা, বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা, নির্মমতা লক ডাউ নে কুৎসিত ভাবে প্রকাশ পেলো।

আদিত্য ভট্টাচার্যের গবেষণা বা কে আর শ্যাম সুন্দর এর গবেষণা দেখিয়েছে, বর্তমানের শ্রম আইনগুলো প্রায় ৯০% শ্রমিকের জন্য অপ্রাসঙ্গিক আজ। শ্যাম সুন্দরের অনবদ্য ভাষায়, সেগুলো আজ আর কাগুজে বাঘও নয়। শ্রম আইনের সংস্কার নিয়ে সংসদে ২০১৯ সাল থেকে শিল্প সম্পর্ক কোড এর স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট পড়ে আছে। সেগুলোকে উপেক্ষা করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান সরকার সহ অন্যান্য সরকার অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে একই মজুরি রেখে কাজের সময়সীমা ১২ ঘন্টা করে দিয়ে, যৎসামান্য সুরক্ষা গুলোকে জলাঞ্জলি দিল এতিহাসিক মে দিবসের মাসে। এই পরিবর্তন শ্রমিকের শ্রমশক্তি, শরীর, স্বাধীনতা ও মানুষের শ্রম মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করলো। আসলে এই শ্রম শক্তিটাকেই নতুন ভারতের আধুনিক ক্রীতদাসত্বে রূপান্তর ঘটাতে চলেছে;নতুন শূদ্র সমাজের সৃষ্টি করবে মনু বাদীরা।

অর্ডিন্যান্স গুলো পুনরায় আমাদের গুরুতর উদ্বেগকে সত্য বলে প্রমাণিত করলো যে, "হিউম্যানিটেরিয়ান ইমার্জেন্সী" ক্ষমতাকে কি ভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলো স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতায় পর্যবসিত করলো। এবং এমন একটা সময়ে যখন সামান্য প্রতিবাদের সুযোগটুকু ও অপসারিত। যা কিছু করা হচ্ছে, চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সবই জনসাধারণের"মঙ্গলের" জন্য, তাদের সুরক্ষার নামে। টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ এ রক্তমাংসের মানুষের অংশগ্রহণ তাই বাদ। ধনীর উপর কর বসিয়ে অর্থ আদায় করে তা করোনা রিলিফ প্রকল্পে ব্যয় করা যেতে পারে, —এটুকু প্রবন্ধ লিখে মতপ্রকাশ করাতেই চারজন সিনিয়র রাজস্ব আধিকারিক সাসপেন্ড হোয়েছেন। কোনও আইনের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও আরোগ্য অ্যাপ ব্যবহার বাধ্যতামূলক বলে ফতোয়া জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

করোনা মোকাবিলার প্রধান দাওয়াই —সামাজিক দূরত্ব।কিন্তু এই সুযোগে ভারত সরকার, তার শাসক দল, সংঘ পরিবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আরো সামাজিক দূরত্ব বাড়িয়েছে। ঈদের আগেই করোনা দূর হয়ে যাক - প্রধানমন্ত্রীর এহেন বার্তা তাঁর ই ভক্তদের দ্বারা তীব্রভাবে ট্রোলড। পাশাপাশি, ধনী, মধ্যবিত্ত সমাজের সাথে হাজার লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক দের সাথে সামাজিক দূরত্ব করে দিল।

করোনার বিরুদ্ধে "যুদ্ধ" শুরু হয়েছিল "জান হ্যায় তো জাহান হ্যায়" দিয়ে। ৫০দিনের মাথায় বলা হচ্ছে, "জান আউর জাহান"! জীবন যাবে, জীবিকা যাবে, ভাইরাস নিয়েই বাঁচতে হবে। জীবন যাবে গরীবের, জীবিকাও যাবে তাদের, আর আমরা শুধু দেখে যাবো। আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি নতুন সমীকরণ: গণতন্ত্রকে সংকুচিত কর, সম্প্রদায়গত দূরত্ব ও বিদ্বেষ বাড়াও, হতদরিদ্র ভারত থেকে দূরত্ব বাড়াও, হৃদয়হীন থাকো, কোনও দায়বদ্ধতা রেখো না। প্রশ্ন হল, আমরা কি মেনে নেব?

২০০৭ সালে নওমী ক্লেইন তার সাড়া জাগানো "The Shock Doctrine"-এ দেখিয়েছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় (হ্যারিকেন কাটরিনা) যুদ্ধ (ইরাক যুদ্ধ অথবা ৯/১১ সেপ্টেম্বরের মত ঘটনা কে হাতিয়ার করে শক থেরাপি দিয়েছে আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ।মিল্টন ফ্রেডমান এর মত ছিল, যত সংকট, বৃহৎ বিপর্য য় আসবে তত পুঁজিবাদের রমরমা হবে।সহজেই তখন জরুরি।পরিস্থিতির সুযোগে কর্পোরেট পুঁজি সরকারি বিনিয়োগ কে হটিয়ে দেবে, সরকারি সংস্থাগুলোকে বেসরকারিকরণ করে আধিপত্য কায়েম করবে। কাটরিনার ক্ষেত্রে দেখা গেলো, সবচেয়ে আক্রান্ত নিউ অর্লিনস স্টেট এ সমস্ত সরকারি স্কুল, হাসপাতাল, এমনকি নতুন গৃহ নির্মাণ বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এগুলো যাতে কঠোরভাবে কার্যকর হয় তার জন্য রাষ্ট্র আরো দায়বদ্ধ হীন ক্ষমতা ভোগ করবে, শক থেরাপি দেবে। ক্লেইন এর নামকরণ করেছেন "ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম"।

পুনশ্চ: প্রেসে যাবার পরে অবস্থার সামান্য তফাত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের তিনজন বিচারপতির বেঞ্চে অবশেষে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিদারুণ অবস্থা দেখে হাস্তক্ষেপ করেছেন এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে একাধিক অভ্যাদেশ দিয়েছেন। সলিসিটর জেনারেলের মিথ্যাবচন সুপ্রিম কোর্টে আজ প্রমাণ হয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি (তুষার মেহেতা) আবেদনকারীদের আইনজীবিদের কুরুচিকরভাবে আক্রমণ করেছেন। তা নিয়ে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

সমাজকর্মী সুধা ভরদ্বাজ দীর্ঘদিন ধরে জেলে বন্দি। বারবার তাঁদের জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বর্তমান মুম্বাই-এর বাইকুল্লা মহিলা জেলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত বন্দি সঙ্গে থাকা ও বিশেষত তাঁর নিজের উচ্চ রক্তচাপ ও সুগারের সমস্যা থাকায় স্বাস্থ্যের কারণে জামিনের আবেদন করেছিলেন। এক্ষেত্রেও জামিন না-মঞ্জুর হয়। আগামী সপ্তাহে অপর দুই বন্দি সোমা সেন ও ভারভারা রাও জামিন সংক্রান্ত শুনানি হওয়ার কথা। সমিতি সুধা, ভারভারা রাও সহ এলগার পরিষদ কেসে ধৃত সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি করছে। করোনা সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে সুপ্রীম কোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও বন্দিমুক্তি উপেক্ষিত!

লক-ডাউন কিংবা বিপর্যয়: প্রতিহিংসার রাজনীতি ও গ্রেপ্তারি চলছেই

রঞ্জিত শূর

মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে দেশজুড়ে লক-ডাউন চলছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা আইন ২০০৫ এবং মহামারী আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হাজারো অন্যায় সত্বেও মানুষ সগঠিত প্রতিবাদে সামিল হতে পারছেন না। কারণ সমস্ত ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ 'অপ্রয়োজনে' ঘরের বাইরে যাওয়া। দেশে এই মুহূর্তে নেই কোন কার্যকরী বিচারব্যবস্থা, পার্লামেন্ট। আছে শুধু এক্সিকিউটিভ- আমলাতন্ত্র এবং পুলিশ- মিলিটারি। বিপর্যয় মোকাবিলা আইন সামনে রেখে সংবাদমাধ্যমকেও পজিটিভ খবর করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। সারা দেশের মানুষ চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কার্যত পথকুকুরের জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। সংক্রমণের আতঙ্কে রাজ্যে রাজ্যে সাধারণ জেল বন্দীদের একাংশকেও প্যারোলে জামিনে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরকম এক পরিস্থিতিতেও কিন্তু বন্ধ হয়নি প্রতিহিংসার রাজনীতি, ভিন্নমতের আন্দোলনকারীদের মিথ্যা মামলায় জেলে পোরা। সাজানো অভিযোগে মামলা দায়ের। একটি-দুটি নয় একের পর এক। বিস্মিত নাগরিক সমাজ, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। প্রতিবাদ জানাচ্ছেন নিজের মত করে। গা করছে না সরকার। চালিয়ে যাচ্ছে মামলা দায়ের, গ্রেফতার।

লক-ডাউনের মধ্যেই ১৪ এপ্রিল অধিকার আন্দোলনের সুপরিচিত মুখ আনন্দ তেলতুম্বে এবং গৌতম নভলাখাকে এলগার পরিষদ মামলায় গ্রেপ্তার করে এনআইএ। কাশ্মীরের চিত্র সাংবাদিক মাসরাত জাহারাকেও গ্রেপ্তার করা হয় ২০ এপ্রিল। কাশ্মীরের আরও দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা আনা হয়েছে। তারা হলেন পীরজাদা আশিক এবং গোহর গীলানি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা সংবাদ লেখার আগে সরকারের কাছ থেকে খবর কনফার্ম করেনি। চিত্র সাংবাদিক মাসরাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ফেসবুকে 'জঙ্গিদের' শেষ যাত্রার ছবি ইত্যাদি আপলোড করেছেন। ১০এপ্রিল জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিরান হায়দার এবং সাফিয়া জারগারকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিল্লির সাম্প্রতিক 'দাঙ্গা'র পরিকল্পনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। সাফিয়ার বিরুদ্ধে ১৮ টা মামলা দেওয়া হয়েছে। সাফিয়ার সংগে একটি মামলাতে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ওমর খালিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই ইউএপিএ দেওয়া হয়েছে।

২৬ এপ্রিল জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি সিফাউর রহমান এবং আরো একজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তাদেরও যুক্ত করা হয়েছে দিল্লির 'দাঙ্গা' মামলায়।

২৭ এপ্রিল ছাত্র সংগঠন আইসার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি কাউলপ্রীত কাউরের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ তার মোবাইল ফোন 'সিজ' করে এবং তার বিরুদ্ধে ইউএপিএ-তে মামলা দায়ের করে।

৩০ এপ্রিল ফেসবুক পোস্টের জন্য দিল্লির সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সিডিশন কেস দেওয়া হয়েছে। ফেসবুকে তিনি ভারতের মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের বাদ দিলে দিল্লীর বিভিন্ন জায়গায় গ্রেপ্তার হওয়া প্রায় সবাই শাহিনবাগসহ বিভিন্ন জায়গায় সিএএ এবং এনআরসি-এনপিআর আন্দোলনের সংগঠক নেতা-নেত্রী। তালিকা দেখলেই বোঝা যায় বেছে বেছে মুসলমান আন্দোলনকারিদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, দাঙ্গার পিছনের শক্তিকে খুঁজে বের করতেই এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন তাই। দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকা থেকে আট শতাধিক মুসলিম নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদের অধিকাংশই দাঙ্গায় ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত। আক্রান্ত-ক্ষতিগ্রস্তদেরই ফের গ্রেপ্তার করেছে সরকার।

ভীমা কোরেগাঁও এর অশান্তির সময় গন্ডগোলের মূলহোতা হিন্দুত্ববাদী মিলিন্দ একবোটে ও তার সহযোগিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। দিল্লির ক্ষেত্রেও হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজ কপিল মিশ্রদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। অথচ তিনি ছিলেন প্রকাশ্যেই দাঙ্গার মূল কান্ডারী। আক্রান্তরাই সরকারের দ্বারা ফের আক্রান্ত হল এবং তাদের আশ্রয় হল বা হতে চলেছে জেলের চার দেওয়াল।

লক-ডাউনের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ সরকার স্বাধীনচেতা সাংবাদিক 'দ্য অয়ার' নিউজ পোর্টালের সম্পাদক সিদ্ধার্থ বরদারাজনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করেছে। আইনজীবী প্রশান্তভূষণ রামায়ণ মহাভারতকে আফিমের সংগে তুলনা করায় তার বিরুদ্ধে ভাবাবেগে আঘাতের মামলা দায়ের হয়েছে। মামলা হয়েছে সমাজকর্মী

কান্নন গোপিনাথনের বিরুদ্ধেও।

লক-ডাউন এবং করোনার সর্বগ্রাসী আবহাওয়ার মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল সারা দেশের কোনো রাজ্যে একজনও রাজনৈতিক বন্দীকে প্যারোল বা জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়নি। সুপ্রীম কোর্টের ঘোষিত মানদণ্ড পূরণ করা সত্ত্বেও।

কোবাড গান্ধী, আনন্দ তেলতুম্বে, ভারাভারা রাও, জি এন সাঁইবাবা সহ প্রবীণ অসুস্থ রাজবন্দিরা জামিন বা প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য নির্বিশেষে সমস্ত আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অথচ সারা দেশে এই সময়ে সব জেল মিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার বন্দী জামিন বা প্যারোলে ছাড়া পেয়েছেন। প্রবীণ, অসুস্থ, মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতিও কোনরকম নরম মনোভাব দেখানো হয়নি।পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই প্রশ্নে অন্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে একই অবস্থানে আছে। এই প্রশ্নে আদালত ও সরকারের একই অবস্থান। মহামারী হোক বা বিপর্যয় ভিন্নমত দমনে নিজের অবস্থানে অনড় আছে ভারত রাষ্ট্র।

ঘটনাপ্রবাহ ১:

বিচার নাকি বদলা

নাতিদীর্ঘ টানাপোড়েনের পর গত ২০ মার্চ যতি পড়ল চারটি জীবনে। করোনা-ত্রস্ত দেশবাসীর একাংশ চার-চারটি জীবনে যবনিকার ওই ঘটনাও অবশ্য সেলিব্রেট করলেন লাড্ডু বিলিয়ে, টিভি ক্যামেরার সামনে ভিকট্রি চিহ্ন দেখিয়ে! নির্ভয়ার ধর্ষক-খুনি হিসাবে চিহ্নিত মুকেশ-বিনয়-পবন-অক্ষয়দের প্রতি ঘৃণার বিস্ফোরণে চাপাই পড়ে গেল 'হেট দ্য সিন নট দ্য সিনার'-এর মর্মকথা। জীবন একটাই—আগাম জানিয়ে শেষের কাউন্টডাউন যে কতটা নির্মম—ক'জনই বা সে অনুভবের তোয়াক্কা করলেন! মুকেশদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মারাত্মক। কিন্তু, চোখের বদলে চোখের দাবিই বা কতটা সুস্থতার লক্ষণ?

মানুষ মাত্রেই ভুল করে। বিচারকেরও ভুল সম্ভব। অন্য সাজায় ভুল প্রমাণে শুধরে নেওয়ার সুযোগ থাকে। মৃত্যুদণ্ড অপরিবর্তনীয়। ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। তাই মৃত্যুদণ্ড বাতিলের দাবি বহু দিনের। এপিডিআরও যে দাবি জানিয়ে আসছে কয়েক দশক ধরে।

তিহারের ৩৫ বছরের জেলার সুনীল গুপ্তা গত নভেম্বরে প্রকাশিত বই 'ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট'-এ জানিয়েছেন, নির্ভয়ার ঘটনায় একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী নিহত তরুণীর বন্ধুকে জেলে অভিযুক্ত শনাক্তকরণে আনা হয়েছিল বিধি ভেঙে সন্ধ্যার পরে। নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে পুলিশের উপস্থিতিতে টিআই প্যারেড হয়। মুকেশের দাদা রাম সিংয়ের মৃত্যু হত্যাই —এমনও জানিয়েছেন ওই প্রাক্তন কারাকর্তা।

এ-সবে ওদের অপরাধ লঘু হয় না অবশ্যই। কিন্তু বিচারে যে ভুল হয়, ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসির ময়নাতদন্তে সেটা চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়েছেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের দুই অধ্যাপক প্রবাল চৌধুরী ও দেবাশিস সেনগুপ্ত কয়েক বছর আগের গবেষণায়। প্রমাণহীন 'অপরাধে' ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল ধনঞ্জয়ের।

মৃত্যুদণ্ড অমানবিক, নিষ্ঠুর। অপরাধের প্রতিরোধক বা ডেটারেন্টও নয়। ঘটনা হল, সত্তর দশকের মাঝামাঝিও পৃথিবীতে মোটে ১৬টি দেশ মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করেছিল, এখন তা প্রায় ১৪০। ইউরোপ জুড়ে মৃত্যুদণ্ড বিলোপে অপরাধ বেড়েছে, প্রমাণ নেই। মৃত্যুদণ্ড আছে যেখানে, অপরাধ কিন্তু কমেনি। আরব, চিন, আমেরিকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের বীভৎসতা শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত বইয়ে দেয়। তবু চার জনের ফাঁসিতে উল্লাস হল এ দেশে!

এ ভাবেই গণ-হিস্টিরিয়ায় মদতের সচেতন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে চলে রাষ্ট্রের নিজের নৃশংসতাকে বৈধতা দেওয়ার খেলা। কাশ্মীরের মেয়েদের নিত্য-নিগ্রহে অভিযুক্ত জওয়ানদের আড়াল করা হয়। যেমন হয়েছে থাংজাম মনোরমার ধর্ষক-খুনিদেরও। গণ-উন্মত্ততায় শ্রমিক-কৃষক-বেকারের যন্ত্রণাও চাপা পড়ে যায়!

ওডিশার কেওনঝরে ঘুমন্ত অবস্থায় গাড়ির মধ্যে স্বামী গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনস এবং দুই শিশুসন্তান—টিমোথি ও ফিলিপকে পুড়িয়ে মারার মামলায় গ্ল্যাডিস স্টেইনস কিন্তু দারা সিংদের ক্ষমা করে দিয়ে বলেছিলেন, প্রতিহিংসার আগুন পোড়ায় নিজেকেও। স্বজন হারানো মানুষের দুঃখ-ক্রোধ অমূলক নয়। ফাঁসিতে ঝুলতে যাওয়া মানুষটিরও কিন্তু স্ত্রী-সন্তান-পরিজন থাকে। তাঁদের জীবনে নিষ্ঠুর পরিণতি কী করে মনে শান্তি আনতে পারে? মানবতার এই শাশ্বত-সুরই শোনা গিয়েছিল কয়েক বছর পর বিলকিস বানোর কথাতেও। ২০০২-এ গুজরাট গণহত্যার সময়ে উপর্যুপরি ধর্ষিতা হয়েছিলেন। বহু বছর ধরে অসম সাহসে আদালতে লড়াই চালিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বম্বে হাইকোর্ট পাঁচ পুলিশ আর দুই ডাক্তারকে খালাসের আগের নির্দেশ নাকচ করে দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেয়নি। বিলকিস বলেছিলেন, 'আমি তো বিচার চেয়েছি, বদলা নয়।'

লক -ডাউন এবং বলির পাঁঠা "পরিযায়ী শ্রমিক"

সঞ্জীব আচার্য্য

করোনা ভাইরাসের দাপটে সারা পৃথিবী বিপর্যস্ত। সংক্রমণ ঠেকাবার একমাত্র উপায় হিসাবে সমস্ত দেশেই সোশ্যাল ডিস্ট্যানসিং কে বেছে নিয়েছে। প্রতিষেধক নেই, ওষুধ নেই বহুমাত্রিক বাহক এই ভাইরাসের। তাই লক -ডাউন একমাত্র অস্ত্র। এমনটাই মনে করছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। গত ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ ঘোষণা করলেন ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে লক -ডাউন এর। এর আগে দিব্যি চলছিল। ২২ মার্চ জনতা কার্ফুতে ঘন্টা বাজানোতে লোকে উৎসবের মেজাজে বাজিও ফাটিয়েছিলো। টিভি চ্যানেলে মধ্যপ্রদেশের সরকার বদলের নাটকের মৌতাত ও পাওয়া যাচ্ছিলো। এরই মধ্যে হটাৎ লক -ডাউন এর ঘোষণা। যে যেখানে আছে, যে অবস্থায় আছে আটকে গেলো। সকলকেই ঘরে থাকতে হবে তাহলেই বাঁচবে দেশ। অত্যাবশ্যক পণ্য কেনার জন্য কেবল বাইরে যাওয়ার ছাড় পাওয়া যাবে। লক -ডাউন এর প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও সকলেই এই হটাৎ লক -ডাউন এর ঘোষণায় বিপদে পড়লো। যারা বাইরে না বেরোলে রোজগার পুরোপুরি বন্ধ তারা আরো বিপদে পড়লো। এদের সংখ্যাই কিন্তু ৯০ শতাংশের বেশি। এরা অসংগঠিত। ঘরে আটকে থাকলে শুধু রেশন দিয়ে কদিন চলবে। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা হলো পরিযায়ী শ্রমিকদের। যারা রোজগারের জন্য গ্রাম ছেড়ে, জেলা ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র বাস করে। লক-ডাউন এর ফলে তাদের কাজ বন্ধ। কিন্তু তারা তাদের গ্রামে ফিরতে পারবে না। ট্রেন, বাস বন্ধ। রাস্তায় যাতায়াতও বন্ধ। এই অবস্থায় অথৈ বিপদে পড়লো কয়েক কোটি পরিযায়ী শ্রমিক। হাতে পয়সা নেই, অনেকের থাকার জায়গা নেই, খাবারের সংস্থান নেই, সাথে রেশন কার্ড নেই, সংগঠিত ইউনিয়ন নেই, স্থানীয় পরিচিতি নেই, পরিচিত নেই, দেখবার কেউ নেই, বাড়ির লোকেরা কেমন আছে সে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই — এইরকম শোচনীয় অবস্থার মধ্যে লক -ডাউন এর অকস্মাৎ ঘোষণায় বিপদের গলাজলে ডুবে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকেরা মাথা পর্যন্ত ডুবে গেলো। দেশের প্রধানমন্ত্রী মাত্র ৪ ঘন্টা সময় দিয়ে সবকিছু স্তব্ধ করে দেওয়ার সময় এই কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের বিপন্নতার কথা মাথায় আনলেন না। সবকা সাথ সবকা বিকাশ !

এমনি অবস্থাতেই পরিযায়ী শ্রমিকেরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বঞ্চিত ও শোষিত। ২০০১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ কোটির বেশি। কেউ গ্রামান্তরে, কেউ জেলান্তরে, কেউ রাজ্যান্তরে পরবাসী, পেটের জ্বালায় জীবিকার খোঁজে। এদের কেউ গৃহ পরিচারক, কেউ নির্মাণ শিল্পের শ্রমিক, কেউ রাস্তায় ছোট স্টলে বা রেস্তোরায় কর্মী, কেউ ডেলিভারি বয়, কেউ সোনার দোকানে র শ্রমিক। সবাই অস্থায়ী। অসংগঠিত। দৈনিক আয় ২০০ - ৪০০ টাকা। যদিও ভারতের দক্ষ, অর্ধদক্ষ, এবং অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য আইনি ন্যূনতম মজুরি যথাক্রমে ৬৯২, ৬২৯ এবং ৫৭১ টাকা। এই আয় থেকেই বড় শহরে থেকে খেয়ে সংসারের জন্য পাঠাতে হয়। ফলে নিজের জন্য খরচের উপায় নেই। এদের মধ্যে ৫০% এর কম শ্রমিক ভাড়ার বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকে। মাত্র ৩% নিজের সঙ্গে পরিবারের লোকজন রাখতে পারে। ২৫% রাস্তায় বা ফুটপাথে রাত কাটায়। পুলিশ এবং স্থানীয় দাদাদের সাথে বন্দোবস্ত করে। অনেকে আবার ভাড়া বাড়িও ১২ ঘন্টা করে শেয়ার এ পায়। চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকে কবে বাড়ি ফিরতে পারবে, দুদিন মানুষের মতো কাটাতে পারবে। এদের মাত্র ৪% এর কাছে রেশন কার্ড আছে। কয়েক কোটি মানুষ জীবিকার জন্য অন্য রাজ্যে থাকতে বাধ্য হয় অথচ এক রাজ্যের রেশন কার্ড অন্য রাজ্যে চলে না।

কম মজুরি, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, থাকা খাওয়ার অব্যবস্থা সব মিলিয়ে এক দুর্দশাগ্রস্থ জীবন। এই শ্রমিকেরা কেউ এলাকার ভোটার না হওয়ায় এদের সুখ সুবিধার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিরা উদাসীন। সংগঠিত এবং স্থানীয় না হওয়ার কারণে মালিক এদের হয়রানি করলেও এরা নিরুপায়। সেই জীবনেই অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এলো হটাৎ লক -ডাউন এর ঘোষণায়। প্রাথমিকভাবে লক-ডাউন এর তাৎপর্য বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লাগলো। তারপর যখন বুঝতে পারলো কাজ বন্ধ, মজুরি বন্ধ অথচ কাজের এলাকাতেই থেকে যেতে হবে তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। সরকার বাড়ি ফেরা আটকে দিয়েছে কিন্তু খাওয়ানো বা বাসার বন্দোবস্ত করেনি। অনেকেই লক-ডাউন এর মধ্যেই বাড়ি ফেরার চেষ্টা করলো। অনেককে যেতে হবে ১০০ কিলোমিটার কাউকে ৫০০ কিলোমিটার আবার কাউকে বা হাজার কিলোমিটার। রাস্তায় কোনো খাবার জুটবে না। জলের সংকট। তার উপর ভয় পুলিশের। লক-ডাউন এ রাস্তায় বেরোনোর জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। তবুতো বাড়ি ফেরা যাবে। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মা কিংবা শিশু পুত্র কন্যা আটকে রয়েছে। এদিকে নিজের থাকা খাওয়া অনিশ্চিত হয়ে যাবে। তাই হাজার ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই পায়ে হেঁটেই বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করল।। কারো সাথে বাচ্চা। রণবীর সিং দিল্লিতে ডেলিভারি বয় এর কাজ করতো। দিল্লি থেকে মহারাষ্ট্র ফেরার চেষ্টা করলো। ফেরার পথে খাবার শেষ। আগ্রা পর্যন্ত পৌঁছেই তার জীবন শেষ। বাড়ি ফেরা হলোনা। ১২ বছরের বালিকা জামলো মকদম (শিশুশ্রমিক) তেলেঙ্গানা থেকে ছত্তিসগড় যাত্রা শুরু করেছিল বাকিদের সাথে। পাকা রাস্তায় পুলিশের হয়রানির ভয়। তাই জঙ্গল, খানা খন্দ পেরিয়ে যেতে হচ্ছিলো। বাড়ি পৌঁছাতে ১২ কিমি বাকি। মকদম

এর পেটের সমস্যা হয় এবং ডি হাইড্রেশনে মারা যায়। বাড়ি আর ফেরা হলো না। রাস্তায় বাড়ি ফিরতে চাওয়া শ্রমিকদের উঠবোস করানোর ছবি ও দেখা গেলো এবং অনেকেই এতে পুলিশের দায়িত্ববোধের ইঙ্গিত পেলেন, কিন্তু মকদমের কান্না শুনতে পেলেন না। উত্তরপ্রদেশে ট্রাক দুর্ঘটনায় মারা গেলো ২৬ জন। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার চারজন মারা যায় এই দুর্ঘটনায়। আহত হয় অনেকে। যোগী সরকার আহতদের মৃতদের সাথে একই গাড়িতে করে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে। এমনকি দিলীপ ঘোষ ও এই ঘটনায় লজ্জা পান। এইভাবে বাড়ি ফেরার পথে প্রায় ৩০০জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলো। বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান পাঠানো হলো, কিন্তু দেশের মধ্যে আটকে পড়া মানুষদের জন্য সরকার কোনো দায়িত্ব নিলেন না। মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় ক্ষমতা দখলের জন্য লক -ডাউন ঘোষণা হলো দেরিতে কিন্তু ঘোষণার পর শ্রমিক দের বাড়ি ফেরার যথেষ্ট সময় দেওয়া হলো না। আই. আই. টি র গবেষকদের বক্তব্য মাত্রা চারদিন সময় দিলে এই পরিযায়ী শ্রমিকেরা সকলেই বাড়ি ফিরে যেতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী দিলেন চার ঘন্টা। সংক্রমণ তখনও বেশিমাত্রায় ছড়ায় নি। প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের পরিবারের সাথে বাড়িতে থাকার এই লক -ডাউন এর সময়ে। এই আটকে যাওয়া শ্রমিকদের পরিবার রইলো গ্রামে অভিভাবকহীন আর শ্রমিক রইলো বিভূঁইয়ে অরক্ষিত অবস্থায়। ফলে শাঁখে করাতের জ্বালায় অধৈর্য হয়ে উঠলো এই আটকে যাওয়া মানুষেরা। সূরাতে টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকরা বাড়ি ফেরার দাবিতে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ করে এবং ৯২ জনের বিরুদ্ধে rioting (!) এর মামলা দায়ের করে। মুম্বাইতে বহু শ্রমিক বাইরের রাজ্য থেকে কাজের জন্য আসে। মুম্বাইতে থাকার জায়গার ভীষণ অভাব। মাথা গোঁজার জন্য একটা বিছানা দুজনে ১২ ঘন্টা করে ভাগ করে নেয়। এই অবস্থায় মজুরি বন্ধ, খাওয়া জুটবে কি করে ? অনেকে গ্রামে ফিরতে পারলে অন্তত না খেয়ে মারতে হবে না। অনেকে চাষের কাজে সাহায্যও করতে পারে। লক -ডাউন এ বাড়িতে না থাকলে বাড়ির লোকেরাও বিপদে পড়বে। তাই আটকে যাওয়া শ্রমিকেরা বাড়ি ফেরার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে খবর রটে বান্দ্রা স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেন ছাড়বে। কয়েক হাজার শ্রমিক স্টেশন চত্বরে ভিড় করে ট্রেনে চাপার জন্য। পুলিশ এই ভিড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাত্র ১৪-১৫ জন পুলিশ কয়েক হাজার শ্রমিককে লাঠিপেটা করে ভাগিয়ে দেয়। শ্রমিকরা কোনো প্রতিরোধ ই দেখাতে পারে না। সামাজিক এবং পেশাগত ভাবে এই পরিযায়ী শ্রমিকেরা এতটাই দুর্বল যে এদের কয়েক হাজারের জন্য ১৫ জন পুলিশ ই যথেষ্ট। এরপর দিল্লিতেও বিক্ষোভ হয়। দিল্লি প্রশাসন এই আটকে পড়া শ্রমিকদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেয়। বাস স্ট্যান্ডে হাজার হাজার শ্রমিক ভিড় করে। শ্রমিকদের বিক্ষোভের ফলে দিল্লি বাস স্ট্যান্ডে কিছু বাসের ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বাস ভাড়া দিতে হবে শ্রমিকদের। ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা। এত টাকা অনেকের পক্ষে জোগাড় করাও মুশকিল। সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিঙ ভাঙার অপরাধে আবার লাঠি চার্জ। আটকাচ্ছে প্রশাসন, তাড়াচ্ছে প্রশাসন, আর মার্ খাচ্ছে অসহায় আটক শ্রমিকেরা। ফুল ফুটুক আর ..... অবসন্ত। বিপদ এখানেই শেষ নয়। মার খেয়ে, পায়ে হেটে গ্রামে পৌঁছানোর পর ও মুক্তি নেই। প্রচারের ফলে করোনা নিয়ে যে আতঙ্ক তৈরী হয়েছে তাতে যে কেউ বাইরে থেকে এলেই সন্দেহ করা হচ্ছে সংক্রমণ বয়ে আনছে। অনেক জায়গায় গ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা থেকে কয়েকজন এসে মেদিনীপুর বর্ডার এ আটকে যায়। উত্তরপ্রদেশে বেরিলিতে গ্রামে ফেরা শ্রমিকদের প্রশাসন কীটনাশক দিয়ে ধোয়। যেন এরা জৈব বস্তু। মানুষ নয়। এমনি সাধারণ সময়ে এদের কোনো সামাজিক গুরুত্ব নেই, আর এখন তো নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বাকিদের উপস্থিতি আপদ বলে মনে করছে মানুষ। করোনা আতঙ্ক মানুষের শুভবোধগুলিকেই পাল্টে দিয়েছে। সহনাগরিক সম্পর্কে আন্তরিকতা, সহমর্মিতার বদলে এখন ভয় আর দুশ্চিন্তা চেপে বসছে। এর আগেও মহামারী হয়েছে। কিন্তু এতটা সামাজিক ভীতি এবং অন্যদের বিপদে নিজেদের সরিয়ে রাখার সামাজিক ব্যাধি গ্রাস করেনি। একদিকে অসংবেদনশীল দায়িত্বহীন রাষ্ট্রীয় ফতোয়া আর অন্যদিকে ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া সমাজের প্রত্যাখ্যান— এই দুই চাপ আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে নরকযন্ত্রণা র সমান। এইসব যন্ত্রণার খবর মিডিয়া তে এলেও সরকারের কোনো টনক নড়েনি। এরপর সুপ্রিম কোর্টে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য মানবিক বন্দোবস্ত দাবি করে দিল্লির আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ মামলা করেন। সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিক ভাবে নির্দেশ দেয় এই আটকে পড়া শ্রমিকদের মানুষের মতো শ্রদ্ধা করতে হবে এবং সরকারকেই এদের খাবার এবং থাকার বন্দোবস্ত কর্তে হবে। রাষ্ট্রসংঘের কমিশনারও ভারত সরকারকে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাপারে দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোর্টের নির্দেশের পর সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। State disaster Relief Fund থেকে ২৯০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে এই আটকে যাওয়া মানুষদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্য। রাজ্য সরকারগুলোকে নির্দেশ পাঠায় স্থানীয় স্কুল গুলিতে এদের থাকার বন্দোবস্ত করার জন্য। এই স্কুল গুলিতে বাথরুম সংকট। গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। নির্দেশসত্বেও সকলের কাছে খাবার পৌঁছাচ্ছে না। সংক্রামিত হবার ভয় পদে পদে। শরীর খারাপ হলে আরো বিপদ। হাতে নগদ শেষ। প্রয়োজনীয় ওষুধ কেনা মুশকিল। সরকারি নির্দেশ সত্বেও রাজ্যগুলি সমস্ত আটকে পড়া শ্রমিকের দায়িত্ব নিলো না। তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রায় কোনো দায়িত্বই নিলো না। কেরালায়

ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের "পরিযায়ী শ্রমিক" বলে না, বলে "অতিথি শ্রমিক"। তাই কেরালাতে কিছুটা হলেও ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য মানবিক বন্দোবস্ত হলো। রাজ্যভেদে ব্যবস্থা ও সহমর্মিতা র ফারাক ও থেকে গেলো। কেন্দ্র দেখায় রাজ্যকে আবার রাজ্য দেখায় কেন্দ্রকে। এমনকি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এও বললেন আটকে থাকা শ্রমিকেরা যে রাজ্যের দায়িত্ব নিতে হবে সেই রাজ্যকে। মানুষের জন্যই নাকি রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করেন ! ভোটে দাঁড়ান, মন্ত্রী সান্ত্রী হন। তারাই লোফালুফি খেলতে লাগলেন এই আটক পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে। নির্বাচনে এই শ্রমিকরা কাজে লাগবে না। এমনি সময়ে এই শ্রমিকরা সমাজে খুব দৃশ্যমান নয়। ১৫০ বছর আগে এঙ্গেলস বলেছিলেন " Workers become visible when they become threat to public health".. তখন মহামারী শুরু হতো শ্রমিক বস্তি থেকে। কিন্তু এবারে ভাইরাস আমদানি হয়েছে বিদেশ থেকে। তাই এরা public health র পক্ষে threat ও নয় আবার সামাজিকভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশও নয়। আটকে পড়ার জন্য শ্রমিকদের জন্য কোনো দায় নেই। ৩০ শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে প্রথম করোনা র কেস ধরা পড়ে। তারপর একমাসের বেশি সময় ধরে কেন্দ্র এই ব্যাপারে সতর্ক হয়নি। গুরুত্ব দেয়নি। সংক্রমণ বাড়লেও মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতা দখলের জন্য দেশ স্বাভাবিক রেখেছে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে গুজরাট ও দিল্লিতে ট্রাম্প কে নিয়ে মাতামাতি করেছে। এই সফরে এক হাজারের বেশি বিদেশি এসেছিলো করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল চালু রেখেছে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। আর লক -ডাউন ঘোষণার মাত্র ৪ ঘন্টা পর থেকে সারা দেশে বাস ট্রেন চলাচল পুরো বন্ধ। কতটা নির্দয় অমানবিক এবং অসংবেদনশীল হলে এইভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। হয় সরকারের কাছে এই কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের কোনো আন্দাজ নেই অথবা এদের সমস্যা নিয়ে সরকারের কিছু যায় আসে না। দুটোই মানবতার লজ্জা।

এরপর লক -ডাউন এর সময়সীমা বাড়ানো হলো ৩ রা মে পর্যন্ত। ফলে প্রায় দেড় মাস ধরে এই নরকযন্ত্রণা র মধ্যে কাটাতে বাধ্য করা হলো এই আটকে পড়া শ্রমিকদের। শ্রমিকরা ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠলো। অনেকে অসুস্থ ও হয়ে পড়লো। আবার আদালতে মামলা হলো এই আটকে পড়া শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর দাবিতে। এদের জন্য সরকারি খরচ নিয়েও সরকার চিন্তায় পড়লো। তৃতীয় দফার লক -ডাউন ঘোষণার সময় ২৯ সে এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর ব্যাপারে নির্দেশিকা পাঠায়। রেড জোন, কমলা জোন এবং গ্রিন জোন এর ভিত্তিতে কি পদ্ধতি মানতে হবে এবং কাদেরকে ফেরানো যাবে সে বিষয়ে বিধি ওই নির্দেশিকার মাধ্যমে রাজ্যগুলিতে পাঠায়।

নিজের প্রদেশে শ্রমিকদের ট্রেনে ফিরতে যে নিয়ম করা হয়েছে;

১। পুলিশের কাছ থেকে টাকা দিয়ে ফরম কিনতে হবে,

২। সেই ফরম ইংরাজীতে টাইপ করে ফিলআপ করতে হবে।

৩। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের কাছ থেকে ফিট সার্টিফিকেট নিতে হবে।

৪। নিজের ই মেল আইডি, টেলিফোন নং দিতে হবে।

৫। এরপর সেই ফরম পুলিশের কাছে দিতে হবে।

৬। পুলিশ সেই শ্রমিকের বিস্তারিত তার প্রদেশের সরকারকে পাঠাবে।

৭। সেই সরকার তদন্ত করে দেখবে, সেই শ্রমিক আসল কিনা।

৮।এরপর সরকার সেই প্রদেশের, যে প্রদেশে শ্রমিক আটকে আছেন, সেখানকার পুলিশকে জানাবে।

৯। এবার পুলিশ, শ্রমিকের পরিচয় ঠিকঠাক থাকলে, তাকে pdf ফাইলে ই মেল করে জানাবে তুমি ট্রেনে চড়ার যোগ্য কিনা। (# তথ্যসূত্র : ndtv india)

লক - ডাউন এর সময়ে এই সমস্ত ফর্মালিটি মেনে শ্রমিকদের আবেদন করা প্রায় অসম্ভব। নিয়মের বিধিতেই আটকে যাবে হাজার হাজার শ্রমিক। তখন সরকার প্রচার করবে শ্রমিকেরা আবেদনই করেনি তাই সরকারের দায় নেই। শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর খরচ দেওয়ার দায়িত্ব যে রাজ্যের বাসিন্দা ওই শ্রমিক সেই রাজ্যের অথবা ওই শ্রমিকদের। ট্রেনে করে ফিরলে ট্রেন ভাড়া দিতে হবে ব্যক্তিকে অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে। রেল দাবি করলো ট্রেনের ভাড়ার সাথে আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়তি দিতে হবে। ফলে নির্দেশিকাই সার, শ্রমিকদের ফেরানোর ব্যাপারে রাজ্যগুলি দায়িত্ব নিতে নারাজ। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যই ট্রেন চালানো এবং এর খরচ কেন্দ্র সরকারকে বহন করার দাবি জানায়। বি.জে. পি শাসিত রাজ্যগুলিও ফাঁপরে পড়ে কেন্দ্রের এই নির্দেশিকায়। প্রশ্ন উঠে কেন্দ্রের এই দায়িত্ব অস্বীকারের ভূমিকায়। প্রশ্ন উঠে প্রধানমন্ত্রীর শখ মেটাতে কত টাকা খরচ হয় ? অনিল গালগালির RTI-তে করা প্রশ্নে তথ্য দপ্তর জানিয়েছে প্রধান মন্ত্রীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের একদিনের খরচ ৮.৩ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রজেক্ট দিল্লিতে নতুন পার্লামেন্ট ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদের জন্য খরচ হবে ২০০০০ কোটি টাকা। এর আগে দেশের বাইরে থেকে যাদের বিমানে উড়িয়ে আনা হয়েছিল তাদের এক পয়সা খরচ বহন করতে হয়নি। আর কেন্দ্রের নির্দেশে আটকে পড়া শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরানোর জন্য কেন্দ্র এক পয়সা খরচ করবে না। এমনিতে কোনো নাগরিকের স্বাধীন চলাচলে বাধা দিতে পারে না সরকার। কিন্তু করোনা অতিমারীর কারণ দেখিয়ে সরকার D.M Act (২০০৫) (Diaster Management) চালু কোরেছে। এই আইন অনুযায়ী সংসদ, রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার সকলের ক্ষমতা অচল করে সব ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী এবং তার নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিটি র হাতে ন্যস্ত করা আছে। এই আইনেই আমাকে আপনাকে ঘরে আটকে থাকার নির্দেশ দিচ্ছে সরকার। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রাখার আদেশ। শ্রমিকদের বাড়ি না ফিরে যেখানে আছে, যেভাবে আছে সেইভাবেই আটকে

থাকার নির্দেশ। আটক থাকলে আমার খাবার, ওষুধ কে দেবে এব্যাপারে টালবাহানা। জীবনের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার। সেটা জলাঞ্জলি যাচ্ছে।

কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প সেন্ট্রাল ভিস্তা। পার্লামেন্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীদের বাসভবন দিল্লির যে অঞ্চলে শ্রী এলাকার প্রায় তিন কিলোমিটার বিস্তৃত অংশ নতুন করে গড়ে তোলা হবে। বাজেট ধারা হয়েছে কুড়ি হাজার কোটি টাকা। নতুন নকশাও তৈরি। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রজেক্ট বলে কথা। পর্যাপ্ত PPE কেনার টাকা নেই, আটকে দেওয়া শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর জন্য টাকা নেই কিন্তু ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর নাম স্বর্ণাক্ষরে রেখে দেওয়ার জন্য আকাশচুম্বী মূর্তি তৈরির টাকার অভাব নেই। রবি শ্রীবাস্তবের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৬.৫ কোটি শ্রমিক ভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছে। মাথাপিছু ৬৫০ টাকা করে রেলের টিকিটের দাম হলে মোট খরচ ৩৯০০ কোটি টাকা। সেই টাকা কে দেবে সেই নিয়ে বিতর্ক ? গুজরাটে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি র জন্য খরচ ৩০০০ কোটি টাকা। পি.এম কেয়ার্স এ ৬৫০০ কোটি টাকা, মালিয়া - চৌস্কিদের ঋণ মুকুব ৬৪০০০ কোটি টাকা। রামদেবের জন্য কর ছাড় ২০০০ কোটি টাকা। জানিনা একতার প্রতীক সেই আকাশছোঁয়া স্ট্যাচু কি দেখতে পাচ্ছে যে লখনৌ এর রাস্তায় কৃষ্ণ সাউ সাইকেলের সামনে ৪ বছরের শিশুকন্যাকে বসিয়ে পিছনে ক্যারিয়ার এ দেড় বছরের পুত্র কোলে বসা স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন ৭৫০ কিলোমিটার পথ কিংবা কাঁধে বাচ্ছাকে নিয়ে রাস্তায় মাইলের পার মাইল হাঁটছেন অসুস্থ মা আর প্রশাসন- সরকার এ ওর ঘাড়ে দায় চাপিয়ে মজা দেখছে। এদেশে গরু যাতে রাস্তায় না থাকে তার জন্য বড়ো বড়ো গোশালা বানানোর জন্য পয়সা আছে সরকারের কিন্তু মানুষের জন্য পয়সা র বড়ই অভাব। সরকারি নির্দেশের পরেও রাজ্যগুলি খুব অল্পই ট্রেনে শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা করে। তখন কেন্দ্র সিদ্ধান্ত বদলে ৮৫% খরচ বহন করার দায় নেয়। ৭ মে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজস্থানের আজমের থেকে এবং কেরালার এর্নাকুলাম থেকে একটি করে মোট দুটি ট্রেন পশ্চিমবঙ্গে আনার ব্যবস্থা করেছে। অভিযোগ উঠেছে, তাও মূলত তাতে তীর্থযাত্রীরা ছিল। রাজস্থানের কোটা থেকে কয়েক হাজার পড়ুয়াকে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু প্রান্তিক পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদাসীন। গত ৮ মে রাজ্য সরকার জানিয়েছে আরো ৮টি ট্রেন অন্যান্য রাজ্য থেকে এই রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে আবার রেল দপ্তর উলটো কথা বলছে। সব মিলিয়ে এই জঘন্য রাজনৈতিক তরজায় মূল সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। এমনকি রাজ্যের মধ্যেই বিভিন্ন জেলায় অন্য জেলার শ্রমিকেরা আটকে রয়েছে। তারা ঘরে ফিরতে চাইছে। মিডিয়াতে এই আলোচনাও শুরু হয়েছে যে পরিযায়ী শ্রমিকেরা অন্য রাজ্য থেকে ফিরলে করোনা সংক্রমণ আরো বাড়বে তাই এদের ফেরানোর সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা ? বিদেশ থেকে ফেরানোর সময় এমনকি তীর্থযাত্রী বা পড়ুয়াদের ফেরানোর সময় এই অমানবিক প্রশ্ন তোলা হয়নি। পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্পর্কে সামাজিক সহানুভূতির জায়গাটারও অভাব। দধীচি হওয়ার জন্যই এদের জন্ম। ইটভাঁটা গুলোতে বহু ভিন রাজ্যের এবং ভিন জেলার শ্রমিক আটকে আছেন। বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এদের দেখভাল করছে। এরা নিজের গ্রামে ফিরতে চাইলেও কোনো সুযোগ এমনকি অনুমতিও পাচ্ছেন না। খামারগাছি ষ্টেশানে আটকে থাকা বিহারের শ্রমিকেরা বহুদিন ধরে বাড়ি ফিরতে চাইছে। দশদিন ধরে টালবাহানা চলায় একদিন তারা অনশন করে প্রতিবাদ জানায়, নিজেরাই পায়ে হেটে ফিরে যাবার উদ্যোগ নে। তখন প্রশাসনের টনক নড়ে। ডানকুনিতেও ঝাড়খণ্ডের শ্রমিকেরা নিজেরাই বাড়ি ফেরার জন্য বেরিয়ে পড়ে, কিছুদূর যাবার পর পুলিশ তাদের ফেরত পাঠায়। রায়পুর থেকে ২৪ জন শ্রমিক নিজেদের উদ্যোগেই পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামে ফেরেন এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ করেন। বিভিন্ন রাজ্যে আটকে থাকা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যোগাযোগ করছেন কিভাবে তারা ফিরতে পারেন। সরকারের তরফে কোনো আশ্বাস না পেয়ে দিশেহারা বোধ করছেন। যে রাজ্য থেকে ফিরবেন এবং যে রাজ্যে ফিরবেন সেই দুই রাজ্যের সমন্বয়,উদ্যোগ ও সহমর্মিতা ছাড়া এই অসহায় মানুষদের বাড়ি ফেরা অসম্ভব কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে উদ্যোগ সীমিত। পুরসভা, থানায় জানিয়েও লাভ হচ্ছে না। nodal officer এর থেকেও সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। একে সরকারি উদ্যোগের অভাব এমনকি নিজের খরচে যেতে গেলেও প্রশাসনের অনুমতি লাগবে অথচ আবেদন করেও সেই অনুমতি মিলছে না। লক -ডাউন উঠে গেলে কারখানা চালাতে শ্রমিক লাগবে তাই শিল্পপতিরা চাইছেন শ্রমিকরা বাড়ি না ফিরে কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকুক। শিল্পপতিদের এই ইচ্ছাকে পুরন করার লক্ষেও সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর ব্যাপারে ঢিলেমি দিচ্ছে বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। কেন্দ্র রাজ্য সব সরকার ই এই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কারো কোনো পরিকল্পনা নেই। উদ্যোগ নেই। সরকারের নির্দেশিকা বেরোনোর পর ও শ্রমিকদের কোনো লাভ হচ্ছে না। মরীয়া হয়ে বহু শ্রমিক সাইকেলে, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছে। ৮ই মে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক মালগাড়ি চাপা পড়ে মারা যান। মহারাষ্ট্রের জালনা থেকে মধ্যপ্রেদেশের প্রায় ১৫০ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে ফিরছিলো ২০ জনের এই দল। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ট্র্যাকের উপর শুয়েছিলেন। ভোর সাড়ে পাঁচটায় মালগাড়ি পিষে দেয় ১৬ জনকে। মহারাষ্ট্র সরকার মৃতদের ৫ লক্ষ টাকা করে দেবার কথা ঘোষণা করেছে। অথচ এদের জন্য যদি ট্রেনের বন্দোবস্ত করতেন তাহলে এরা ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরতে পারতেন, ট্রেনে চাপা পড়ে লাশ হয়ে ফিরতে হতো না। এরা কেউ ভোটার নয়। কি লাভ এদের পিছনে খরচ করে? দেশে এখন মানুষ নেই, নাগরিক নেই আছে শুধু ভোটার।

সেই দেশে এ ঘটনা তো ঘটবেই। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে কুমিরের কান্নায় ভুলিয়ে দেবেন।

এই দিনই লখনৌতে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে এক পরিযায়ী দম্পতি কৃষ্ণ সাউ এবং প্রমীলা সাউ। ছত্তিসগড়ের বাসিন্দা এই দম্পতি লখনৌতে ঝুপড়িতে থাকতেন ৮০০ টাকা ভাড়ায়। সঙ্গে থাকত দেড় বছরের ছেলে আর চার বছরের মেয়ে। লক -ডাউন এ হাতের টাকা শেষ। ছেলে মেয়ের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য গ্রামে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। সাইকেলে দুই ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী কে নিয়ে ৭৫০ কিলোমিটার দূরের ছত্তিসগড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিছুদূর গিয়ে বাইপাসে উঠতেই ট্রাক এসে চাপা দেয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মারা যান।

পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়ি থেকে দূরে অর্ধাহারে দুশ্চিন্তার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন শুধু নয় এর সাথে রয়েছে ভবিষ্যতের চিন্তা। সারা পৃথিবী জুড়েই কোটি কোটি লোকের চাকরি চলে যাবে। এবং

এর সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে প্রায় ১২ কোটি লোকের চাকরি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে করোনা র কারণে। এর মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরাই বেশি সংখ্যায় বেকার হবে কারণ তাদের চাকরিগুলোই চুক্তিভিত্তিক, এবং অনিয়মিত। এলাকায় ফিরলেও নতুন করে কিছু জুটবে না। জমিজমা ও ভাগে এমনকিছু নেই যে চাষ করে চালানো যাবে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্র মানুষ এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের সহায়তা দেবার জন্য ১.৭ লক্ষ কোটি টাকা র প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এই প্যাকেজ ২০ কোটি মহিলার জনধন একাউন্ট এ ৫০০ টাকা করে তিনবার, বয়স্ক নাগরিকদের দুবারে ১০০০ টাকা, স্বাস্থকর্মীদের বীমা, উজালা প্রকল্পে গ্যাস এ ছাড়, কৃষকদের ২০০০ টাকা করে তিনবার করে দেবার পর কি আর পড়ে থাকবে। কাজ হারানো পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রায় কিছুই নেই। তার সাথে বড় সমস্যা এই শ্রমিকদের খুব অল্পই রেজিস্টার্ড। নির্মাণশিল্পের শ্রমিকরা BOCW (Building and Other Construction Workers) তে রেজিস্ট্রি করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে BOCW তে মাত্রা ১৮ % শ্রমিক রেজিস্টার্ড। ফলে কোনো প্যাকেজ ঘোষিত হলেও পাওয়ার সম্ভাবনা ভীষণ কম। সব মিলিয়ে বর্তমানের দুঃসহ কষ্ট আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় ভীষণ কষ্টে আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি মালিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে লক-ডাউন এর সময়ে কারো মজুরি কাটা যাবে না, সকলকে পুরো বেতন দিতে হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে মালিকেরা। Stranded Workers Action Network (SWAN) এর সমীক্ষায় দেখা গেছে এই লক-ডাউন পর্যায়ে দৈনিক মজুরির শ্রমিকদের মাত্র ৬ শতাংশের হাতে পুরো বেতন এসেছে। দৈনিক আয়ের স্বনিযুক্ত মানুষের ৯৯ শতাংশ এই পর্যায়ে বেরোজগার হয়ে গেছেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎপাদন এর মাত্রা স্বাভাবিক রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ মতো রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ এর মতো রাজ্যে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা করা হয়েছে বাধ্যতামূলক ভাবে। এ বিষয়ে শ্রমিকের সম্মতি বা শ্রমিক ইউনিয়ন গুলির মতামত ও নেওয়া হয় নি। গুজরাটে অতিরিক্ত সময়ে কাজের জন্য মজুরির হার বাড়ানো হয়নি।

ব্যাঙ্গালোর স্টেশনে জড়ো হয়েছিলো আটক শ্রমিকেরা নিজের রাজ্যে ফেরার জন্য ট্রেন ধরার প্রত্যাশায়। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা ট্রেন ছাড়তে দিলেন না। শ্রমিকরা নিজের রাজ্যে ফিরতে পারবেন না। রিয়াল এস্টেটের মালিকদের সংগঠন (CREDAI) এর সাথে মুখ্যমন্ত্রীর মিটিং হয়েছে। তারা কাজ শুরু করবে। ফলে শ্রমিকদের ছাড়া যাবে না। শ্রমিক বা তাদের কোনো সংগঠনের সাথে কথা বলার প্রয়োজনও বোধ করেনি। এইভাবে জোর করে আটক রাখছে, কাজ করতে বাধ্য করছে। শ্রমিকের মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার (article ২১), স্বাধীনভাবে যাতায়াতের অধিকার (article ১৯), জোর করে কাজ না করানোর আইন (article ২৩) ভঙ্গ করছে সরকার নিজেই। এই বিষয়ে কোর্টে মামলাও হয়েছে। এই শ্রমিকদের ঘামে, রক্তে এই শহরের সমৃদ্ধি,, রাজ্যের উন্নয়ন অথচ এদের কীটপতঙ্গ হিসাবে দেখা হয়। এতদিন কিভাবে থাকছে, কী খাচ্ছে সেবিষয়ে মালিক কোনো দায় নেয়নি। শুধু সরকার বা রাজনৈতিক নেতারাই নয় মালিকের কাছেও এদের দাম কানাকড়িও নয়। আমরা সাধারণ মানুষও এদের দিকে ফিরে তাকাই না। করোনা বা লক -ডাউন এর ফলে বা ট্রেনে চাপা কিংবা রাস্তায় মারা পড়ছে বলে এদের ব্যাপারে নজর পড়ছে। মিডিয়ায় রুটি ছড়ানো রেললাইনের ছবি দেখিয়ে এক সন্ধ্যা মায়াকান্না কাঁদছি। তারপর আবার এরা আড়ালেই থেকে যাবে।এই আধুনিক সভ্যতার মেরুদণ্ড এরাই - এই অসংগঠিত শ্রমিক আর এরাই অবহেলিত সবচেয়ে বেশি। এরাই বলির পাঁঠা।

কোরোনা মহামারি আর লক-ডাউনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও সরকার এবং শাসক দল শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত রাজনীতি করে চলেছে, যাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই আপনাকে দোষী ঠাহর করে বলবে আপনিই এই দুঃসময়েও সবকিছুতে রাজনীতি খোঁজার চেষ্টা করছেন; সেই তাদেরই এখন ঘুম ভেঙেছে; পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাবার কথা বলছে। এতদিন এই ভাবনা কোথায় ছিল! লক-ডাউনের ৪০/৪৫ দিন পর, এত শ্রমিকের মৃত্যুর পর মনে পড়লো দেশের ভেতরে থাকা শ্রমিকদের কথা? লক-ডাউন করার আগে এদের কথা মনে পড়েনি ? তখন মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতা দখলের জন্য ঘোড়া(সাংসদ, নেতা) কেনায় ব্যাস্ত ছিল এরা। এরা ব্যস্ত ছিল ধনী প্রবাসী ভারতীয়দের বিমানে চড়িয়ে দেশের ভেতরে ঢোকাতে। বিদেশ থেকেই এই ভাইরাস এদেশে এসেছে। অনেকেই ঘরে দিব্যি নিশ্চিন্তে এখন লক-ডাউন পালন করতে

করতে মিডিয়াতে গরীবদের নাজেহাল অবস্থার জন্য শ্রমিকদের চেতনা ও নির্বুদ্ধিতাকে ই দায়ী করছে। রোগ ছড়ালো কারা আর খিদের জ্বালায়, ট্রেনের তলায় মরছে কারা! ৭০০/৮০০কিমি, কেউবা ১২০০কিমি পথ হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছে। কেউ ফিরতে পারছে, কেউ পারছে না। কেউ কেউ রাস্তাতেই মরে যাচ্ছে খিদে আর ক্লান্তিতে। এমনই ১৬ জন শ্রমিক ৩৬ ঘন্টা পথ হাঁটার পর রেললাইনের ওপর বসে পড়ে, ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে সেখানেই তারা ঘুমিয়ে পড়লে মালগাড়ি পিষে দিয়ে চলে গেল। যে শ্রমিকেরা সভ্যতার রথের চাকাকে সচল রাখে, তারাই আজ সেই রথের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানো নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে এখনও চাপানোতর চলছে। এ ওকে দোষ দিচ্ছে, ও একে। কেউ বলছে না, ওরা না আনলে আমরাই নিয়ে আসবো পরিযায়ী শ্রমিকদের। তাই নাকি? কেন্দ্র রাজ্যকে শ্রমিকদের ফেরানোর জন্য স্পেশাল ট্রেনের কথা বললেও, নির্লজ্জ রেল মন্ত্রক শ্রমিকদের ভাড়া মেটানোর দাবী থেকে পিছু হঠেনি। নিখরচায় শ্রমিকদের ট্রেনে করে বাড়ি ফেরানোর দাবীতে ছোটো বড়ো অনেক বিরোধী দল মিউ মিউ করে সোচ্চারের সুর তুললেও এখনো পর্যন্ত তার সুরাহা কিছু হচ্ছে না। উল্টে দেশের বাইরে থাকা প্রবাসীদের ভেতরে ঢোকাতে জাতীয়তাবাদে সুরসুড়ি দিয়ে 'বন্দে ভিশন ' মিশনে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। দিন যত যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। যখন রাজ্য, কেন্দ্র পরিযায়ী শ্রমিকদের দেরীতে হলেও ফেরানোর উদ্যগ নিচ্ছে, যখন শ্রমিকরা মরিয়া হয়ে উঠেছে বাড়ি ফেরবার জন্য, ঠিক তখনই বেঁকে বসেছে শিল্পপতি, কারখানার মালিকরা। লক-ডাউন উঠে গেলে ক্ষতি পূরণ করতে চটজলদি কারখানায় উৎপাদন চালু করতে হবে, তখন শ্রমিক লাগবে তাই এই পরিযায়ী শ্রমিকদের এখনই ফেরানো যাবে না। তাই সুরাট থেকে শুরু করে তামিলনাড়ু, বান্দ্রা, হায়দ্রাবাদ - সর্বত্র শ্রমিকদের বিক্ষোভ অব্যাহত। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাবার সিদ্ধান্ত কি আগেই নেওয়া যেত না? যেত, কিন্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুঁজিতে চলা সরকার, আম্বানি, আদানিদের অঙ্গুলি হেলনে চলা নেতারা সে সব ভাবনার ধার কাছও মাড়ায়নি। এই শ্রমিকরা, জীবিত অবস্থায় তাদের মূল্য ভোটার হিসেবে আর মৃত অবস্থায় সস্তা রাজনীতির উপাদান। তাই এই অবস্থায় খেটে খাওয়া গরীব, শ্রমজীবী মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে সকলকে। সস্তার ভোট সর্বস্ব রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

ঘটনাপ্রবাহ ২ :

রহস্যময় তহবিল

মার্চের বেতনের আগেই করোনা-পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের কাছে এক দিনের বেতন দানের আহ্বান জানানো হয়েছিল কর্তৃপক্ষের তরফে। ভারতীয় রেলবোর্ড-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গত ২৭ মার্চ চিঠি দিয়ে আবেদন করে, স্টাফ এবং অফিসাররা যেন এক দিনের বেতন প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ডে (পিএমএনআরএফ) দান করেন। পরে ৩০ তারিখ আশ্চর্যজনক ভাবে একই পত্রাঙ্ক নম্বরে জানানো হয়, দানের টাকা যাবে 'পিএম কেয়ার্স'-এ। আসলে দানও নয়, রীতিমতো জোর করে আদায়। কেননা, বহু সংস্থায় মাসমাইনেই হয়েছে টাকা কেটে নিয়ে।

করোনা-পরিস্থিতিতে পীড়িতের পাশে দাঁড়ানো ও পরিকাঠামো মেরামতে সবার কাছে দানের আহ্বান জানিয়ে এই নতুন ফান্ড—'পিএম কেয়ার্স'-এর কথা ২৮ মার্চ বিকেলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই টুইটে ঘোষণা করেছিলেন। প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গড়া এটি একটি 'পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'। কী ভাবে অ্যাকাউন্টে দান করতে হবে, বলা হয়েছে তাও। কিন্তু এই ফান্ড বা ট্রাস্ট রেজিস্টার্ড কিনা, কী তার ঠিকানা, কবে নথিভুক্ত হল, মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন কী, প্যান আছে কিনা, কারা সাহায্য পাবেন, কী ভাবে খরচ হবে সংগৃহীত অর্থ, কোন সংস্থা অডিট করবে—এ সবই অস্পষ্ট। তাই অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এই 'পিএম কেয়ার্স' নিয়ে।

উপরন্তু জাতীয় বিপর্যয়ের মোকাবিলায় ভারত সরকারের দু'টি তহবিল ছিলই—(১) ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড। এর অর্থের ৭৫% জোগান দেয় কেন্দ্র, বাকি ২৫% দেয় রাজ্যগুলো নিজেদের বাজেট থেকে। যেহেতু বাজেটের অন্তর্ভুক্ত, ক্যাগ-ই অডিট করে। আর একটি তহবিল—(২) প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ড (পিএমএনআরএফ) প্রধানমন্ত্রীরই নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রাস্ট। তৈরি হয়েছিল সেই ১৯৪৮ সালে। আয়কর আইনের ১২এএ ধারায় ট্রাস্ট হিসাবে নিবন্ধীকৃতও। প্যান নম্বর রয়েছে। এটিও চলে সাধারণ মানুষের এবং যে কোনও সংস্থার স্বেচ্ছাদানে। এর উদ্দেশ্য জাতীয় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা বিরাট দুর্ঘটনায় হতাহতদের সাহায্য বা চিকিৎসা সহায়তা-সহ সম্বলহীন পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। অডিট করে একটি চার্টার্ড ফার্ম। প্রতি বছর সাহায্যপ্রাপ্তদের তালিকা-সহ বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় ওয়েবসাইটে।

তা হলে নতুন করে কেন 'পিএম কেয়ার্স', প্রশ্ন সেখানেই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অবশ্য নানা নতুন 'আইডিয়া'র কথা বলে থাকেন 'মন-কি বাত'-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। অনেক পুরোনো কিছুর নতুন নামকরণও ইতিমধ্যে করেছেন। কিন্তু নতুন তহবিল নিয়ে সংশয় বর্তমান বৃহৎ সঙ্কট এবং সম্ভাব্য বিপুল সংগ্রহের প্রেক্ষিতে অন্য মাত্রা পাচ্ছে। অস্বচ্ছতার প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

তেলিনিপাড়ার সাম্প্রদায়িক ঘটনাসমূহ : একটি এপিডিআর তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

বঙ্গানুবাদ : দীপ্রনীল রায়

ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত তেলিনিপাড়া অঞ্চলে গত ১০ই ও ১২ই মে, ২০২০ তারিখে কিছু সাম্প্রদায়িক গোলমাল ঘটেছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ মূলতঃ মিশ্রপ্রকৃতির। জুটমিল স্থাপনের আগে থেকেই কিছু বাঙালি হিন্দু বসবাস করছেন। এদের সাথেই আছেন বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আগত অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান, যারা গঙ্গার পশ্চিম পারের ভিক্টোরিয়া, শ্যামনগর নর্থসহ নিকটবর্তী কিছু জুটমিলের শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসেছিলেন।

তেলিনিপাড়ার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করতে গেলে মাথায় রাখা দরকার যে, মূলতঃ অবাঙালি জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন ও দাঙ্গার দীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান।

এপিডিআর হুগলী জেলা কমিটির একটি টিম এই গণ্ডগোলের কারণ, হিংসার ধরণ, তার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, গণ্ডগোলের পিছনে কাদের হাত রয়েছে, প্রশাসনের ভূমিকা এবং রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষ দ্বারা অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সম্বন্ধে জানতে ১৪/০৫/২০২০, ১৭/০৫/২০২০ ও ২৩/০৫/২০২০ তারিখগুলিতে তেলিনাপাড়া পরিদর্শন করে।

তথ্যাবলীঃ এপিডিআর তথ্যানুসন্ধান দল মোকরাম আলি লেন, ফেরীঘাট স্ট্রিট বাইলেন, ফেরীঘাট স্ট্রিট বাই রাজাবাজার লেন, ফেরীঘাট স্ট্রিট বাই নিয়োগীবাগান লেন, গড়ের ধার, সেগুনবাগান লেন, গোবিন্দদেবী লেন, ফেরীঘাট স্ট্রিট, বি.বি.লেন, শ্যামনগর নর্থ জুটমিলের ৯, ১০, ১১, ১২ নম্বর লেবার লাইন, চায়নাপট্টি, গোন্দলপাড়া জুটমিলের মেনগেট থেকে দিনেমারডাঙা মোড় অবধি মধ্যবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন করে।

মোকরাম আলি লেনের মুসলমান অধিবাসীদের সাথে কথা বলে টিম জানতে পারে যে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণের পরে তাদের বাজার যাওয়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি দৈনিক কাজকর্ম এলাকার কিছু সংখ্যক হিন্দুদের বিরোধিতার মুখে পড়তে থাকে; এই আচরণের পিছনে- সাধারনভাবে মুসলমানরাই ভারতে করোনাভাইরাস ছড়াতে সাহয্য করেছে ও সেই কারণে তাদের বাইরে ঘুরে বেড়ানো উচিৎ নয়- এই ধারণা কাজ করেছে। তাদের কাছে এও জানা গেছে যে, মোকরাম আলি লেনের একজন সম্ভাব্য কোভিড-১৯ রোগীর খবরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে; যদিও পূর্বে উল্লিখিত Indian Express এর রিপোর্টে ও অন্যান্য সূত্র অনুযায়ী সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা একাধিক বলে জানা গেছে। মোকরাম আলি লেনের বাসিন্দারা জানান যে, একমাত্র সম্ভাব্য কোভিড-১৯ রোগীর আদতে শ্বাসকষ্টজনিত অ্যাজমা ছিল এবং সম্প্রতি তাঁর টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। এর সাথে সাথে জানা গেছে যে মোকরাম আলি লেনে কোভিড-১৯ রোগী (এক বা অধিক) পাওয়ার খবর ছড়াতে থাকায় এলাকার মুসলমান বাসিন্দাদের নানারকম বাধা দেওয়া হতে থাকে। ১০ই মে, ২০২০ তারিখে এক মুসলমান মহিলাকে গোবিন্দদেবী লেনের মিউনিসিপ্যাল কল থেকে জল নিতে আসতে নিষেধ করা হয় এবং একইধরনের ঘটনা অন্যত্রও ঘটে; পাইকপাড়া মিল লেনের মুসলমান বাসিন্দারা কমিউনিটি বাথরুম ব্যবহারে তাঁদের হিন্দু প্রতিবেশীদের থেকে বাধা পান; পার্শ্ববর্তী হিন্দুঅধ্যুষিত এলাকার স্থানীয় বাজারে ঢুকতে মুসলমান পুরুষদের আটকানো হয় এবং সবশেষে মুসলমান পাড়ার প্রবেশপথ ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো হয়। টানাপোড়েন বাড়তে থাকে, উত্তেজনা চরমে ওঠে।

১০ই মে রবিবার, কিছু মুসলমান দুষ্কৃতী ফেরীঘাট স্ট্রিটে ও বি.বি. লেনে তেলেনিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির (ভিখারি পাসওয়ানের হত্যাস্থল হিসেবে কুখ্যাত) অনতিদূরে হিন্দুদের দোকান ও বাড়িঘর ভাঙচুর করে। এর পরপরই প্রতিআক্রমণ হিসেবে হিন্দুদের শক্তিপ্রদর্শন ও মুসলমানদের দোকান ও বাড়িঘর লুঠতরাজ শুরু হয়। যদিও, টানাপোড়েন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দু'পক্ষই কোনোরকম পুলিশি মধ্যস্থতা ছাড়া নিজেদের রাশ টেনে রাখে। ১০ই মে, ২০২০ রাত দশটায় তেলিনিপাড়ার এক বাসিন্দা এক এপিডিআর সদস্যকে জানান যে, পুরো দিনে উত্তপ্ত এলাকায় একজনও পুলিশের দেখা মেলেনি। ১৪ই ও ১৭ই মে, ২০২০ তারিখে এপিডিআর যাদের সাথে দেখা করেছে, তারা সবাই এই তথ্যই সমর্থন করেছেন। জানা গেছে যে পুলিশ গভীর রাতে ঘটনাগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে।

১১ই মে, ২০২০ তারিখে পুলিশ গোটা এলাকা টহল দেয় এবং তেলিনিপাড়ার কিছু স্থানে কিছু পুলিশকর্মী মোতায়েন করে। দিনমানে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি। তেলিনিপাড়া ঢুকতে চাওয়া স্থানীয় বিজেপি সাংসদ লকেট চ্যাটার্জীকে চন্দননগরে পুলিশ আটকায়। অভিযোগ যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া তাঁর বক্তব্য যে তেলিনিপাড়াবাসী মুসলমানেরা ইচ্ছাকৃতভাবে করোনাভাইরাস ছড়াচ্ছে ও এদের বিরুদ্ধে রাজ্য প্রশাসন কোনোরকম পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তা মুসলমানদের ওপর আক্রমণকে উস্কানি দিয়েছে।

১২ই মে, ২০২০ তারিখে দুপুর ১২টার কাছাকাছি সময়ে হিন্দু দুষ্কৃতীরা একযোগে হিন্দুপ্রধান এলাকাসংলগ্ন মুসলমানদের

ঘরবাড়ি ও দোকানপত্র আক্রমণ করে। এপিডিআর টিমের সদস্যরা দেখেছেন যে, মোকরাম আলি লেন, ফেরীঘাট স্ট্রিট বাইলেন, ফেরীঘাট স্ট্রিট বাই রাজাবাজার লেন, ফেরীঘাট স্ট্রিট বাই নিয়োগীবাগান লেন, গড়ের ধার এলাকাগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসস্থানগুলি বোমের আঘাতে ও অগ্নিসংযোগের ফলে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। অভিযোগ যে, বহুক্ষেত্রে ঘরবাড়ি জ্বালানোর আগে সমস্ত ঘরে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র দুষ্কৃতীরা লুঠ করেছে। এইসমস্ত বাড়িগুলির লাগোয়া এলাকায় যেসমস্ত টোটো, মোটরবাইক, ছোটা হাতি ইত্যাদি রাখা ছিল, সেগুলিতে আগুন লাগানো হয়। কিছুক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে; যথেচ্ছভাবে পেট্রল বোমা ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আধলা ইঁটের টুকরো ও মদের বোতলের ভাঙা কাঁচের টুকরো পাওয়া গেছে। কেবল তার জ্বালানো হয়েছে ও খাটাল থেকে গরু-মোষ লুঠ করা হয়েছে। ১৪ই মে, ২০২০ তারিখে তথ্যানুসন্ধানকারী এপিডিআর টিম নিয়োগীবাগান বাইলেনের বাসিন্দা আব্দুস সালামের বাড়ির ছাদে একটি তাজা বোমা প্রত্যক্ষ করে। এও অভিযোগ যে, আক্রমণের ঘটনার পর পুলিশ যখন এলাকায় ঢোকে, তখন তাদের সাথে দুষ্কৃতীরাও ছিল।

অভিযোগ করা হয়েছে যে, বহিরাগতরা, বিশেষত ব্যারাকপুর থেকে আসা একদল, স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সাহায্যে মুসলমান ঘরবাড়ি ও দোকানপাটের ওপর আক্রমণ করেছে। ভদ্রেশ্বর স্টেশন রোড ও লাইব্রেরী রোডের বাসিন্দারা এপিডিআর টিমকে জানান যে অনেক অপরিচিত মুখকে ১২ই মের দিনের বেলায় এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। ১২ই মে ২০২০ তারিখে মানিকনগরে দ্বারিক জঙ্গল রোডে বোমাভর্তি একটি স্কুটার পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেটি পুলিশ ১৩ই মে বাজেয়াপ্ত করে।

১২ই মে, ২০২০ তারিখে পাইকপাড়া অঞ্চলের শ্যামনগর নর্থ জুটমিলের ৯, ১০, ১১, ১২ চিহ্নিত লেবার লাইনগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করা হয়, কেবলমাত্র ১০ ও ১১ নম্বর লাইনের হিন্দু শ্রমিকদের বাসস্থানকে ছাড় দেওয়া হয়। পাইকপাড়ার জেপিএন স্ট্রিটে একটি হিন্দু দোকান ও বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের একটি অফিস হিন্দু দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর করে। ১ নং লাইন থেক ৯ নং লাইনে যাবার পথে কমিউনিটি বাথরুমের উল্টোদিকের মুসলমানদের বাড়িগুলি আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা হয়েছে, এমনকী ১৭ই মে, ২০২০ তারিখেও সেই ভস্মীকৃত বাড়িগুলি থেকে ধোঁয়া বেরোচতে দেখা গেছে।

মঞ্জুর আলম, ৪৫ ও মহম্মদ আজাদ, ৩৮, দুজনেই যথাক্রমে ৯ ও ১০ নং লাইনের বাসিন্দা, ১০ই মে সন্ধ্যের পাইকপাড়া জুটমিল লাইনের ঘটনায় আহত হন। ভদ্রেশ্বর পৌরসভা দুজনেরই চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিল।

১৭ই মে ২০২০ তারিখে মহঃ আব্দুস সালাম (নাম পরিবর্তিত) নামক এক ব্যক্তির অভিযোগ যে শ্যামনগর নর্থ জুটমিলের ম্যানেজমেন্ট মুসলমান শ্রমিকদের কাজ করাতে অস্বীকার করছে।

বাবুরবাজারে জিটি রোডের সম্মানীয় হাজি বদরুদ্দিন সাহেব মাজার, ভদ্রেশ্বরে হিন্দুস্তান পার্কের একটি মাজার ও ফেরীঘাট স্ট্রিটের একটি শীতলা দেবী মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে।

১২ই মে, ২০২০ তারিখে দুপুর ১২টার দিকে মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের আক্রমণের প্রত্যুত্তরে বি বি লেন ও ফেরীঘাট স্ট্রিটের কিছু হিন্দু দোকানপাট ও ঘরবাড়িতে মুসলমান দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দেয় কিন্তু উল্টোদিকের মুসলমানদের দোকানগুলি অক্ষত থাকে। যে হিন্দু বাসিন্দারা এই আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তারা কেউই আক্রমণে তেলিনিপাড়ার বাইরের দুষ্কৃতীদের জড়িয়ে থাকার কথা বলেননি।

ফেরীঘাট স্ট্রিট ও বি বি লেনের প্রায় ৫৫-৬০ সংখ্যক হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন, শিশুসমেত নিকটবর্তী জুবিলি প্রাইমারি স্কুলে রাখা হয়েছে ১০ই মে, ২০২০ রাত্রে। সেই একইদিন রাত্রে পাইকপাড়ার ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং লেবার লাইনের শিশুসমেত মুসলমান ক্ষতিগ্রস্তরা হাজি মহম্মদ মহসিন প্রাইমারি স্কুল ও মহম্মদ মহসিন প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয়গ্রহণ করেছে। ভদ্রেশ্বর পৌরসভা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা জুবিলি প্রাইমারি স্কুলে থাকা হিন্দুদের সাহায্য করলেও অন্য দুটি প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নেওয়া মুসলমানদের জন্য তা করেননি।

চন্দননগর থানার অন্তর্গত দিনেমারডাঙা থেকে গোন্দলপাড়া জুটমিল যাবার রাস্তাসংলগ্ন এলাকায় কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

তেলিনিপাড়া থেকে দূরে ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত অন্যান্য এলাকা যেমন বাবুরবাজার ও মানকুন্ডুতে বিচ্ছিন্নভাবে মুসলমানদের সম্পত্তি লন্ডভন্ড, লুঠপাট অথবা অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, মুসলমান ও হিন্দু এলাকা থেকে পুলিশ ১২৯ জন পুরুষ ও মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এলোমেলো ও ভিত্তিহীন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ

১। শামা নাজনিন, স্বামী ডাব্লু. আহমেদ, চার সন্তানের মা, সর্বকনিষ্ঠটির বয়স তিন মাস।

২। রবি পাসওয়ান, বয়স ১৮, সিরিয়াস মৃগীরোগী ও সময়মতো ওষুধের প্রয়োগ না হলে আরো সিরিয়াস হবার সম্ভাবনা রয়েছে; সে বারবার পুলিশকে গ্রেপ্তার না করতে অনুরোধ জানালেও পুলিশ তা শোনেনি।

৩। বিপিন রায় এবং তার দুই পুত্র, পুত্রদের মধ্যে একজন রোহিত রায়, বয়স ২০, মানসিক রোগী; এদেরকে গ্রেপ্তারের ফলে

নাবালিকা প্রিয়া রায় (১৩) ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

অসংখ্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অভিযোগ করেছেন যে ভদ্রেশ্বর পুলিশ থানা সম্পত্তি নষ্টের এফআইআর বা জেনারেল ডায়রি নিতে রাজি হয়নি। র‍্যাফ ও পুলিশকর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে যেরকম স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার করেছে ও এলোমেলো গ্রেপ্তার করেছে, তাতে এলাকায় ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়। ১৫ই মে ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা গেছে, সবজি বিক্রেতা, দুধের ভ্যান ইত্যাদি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ঢুকতে না পারায় বাসিন্দারা দুর্ভোগের সম্মুখীন হন এবং র‍্যাফ ও পুলিশ অঞ্চল জুড়ে টহলদারি চালানোয় বোমের আঘাতে আহত মানুষজন গ্রেপ্তার হয়ে যাবার ভয়ে তাদের চিকিৎসা করাতে যেতে পারেননি।

পর্যবেক্ষণ:

১। ১০ই মে, ২০২০ র ঘটনার কেন্দ্রস্থল মূলতঃ ফেরীঘাট স্ট্রিট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ফেরীঘাট স্ট্রিটে ও পার্শ্ববর্তী এলাকা যেমন মোকরাম আলি লেন ইত্যাদি জায়গায় বসবাসকারী মুসলমানরা করোনাভাইরাস ছড়াচ্ছে এই ধুয়ো তুলে, প্রতিবেশী হিন্দুরা তাদের স্বাভাবিক গতিবিধিকে রোধ করে ক্রমাগত কোনঠাসা আর কলঙ্কিত করেছে। কমিউনিটি বাথরুম ব্যবহারে বা কল থেকে জল আনতে বাধাদান করার ঘটনাগুলি এই উপবাসকালীন সময়ে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয় এবং এর ফলস্বরূপ ১০ই মে সাম্প্রদায়িক হিংসার দিকে মুসলমানরা প্রথম পদক্ষেপ নেয়।

২। তেলিনিপাড়াতে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গার দীর্ঘ ইতিহাস যেখানে কখনো কখনো দাঙ্গা বেশি সময়ও স্থায়ী হয়েছে, থাকা সত্ত্বেও এই বর্তমান হিংসা একটি কারণে আলাদা: মাঝে ঘটনাবিহীন একদিনের পর তৃতীয় দিনে আবার পুনরায় হিংসা মাথাচাড়া দেয়, স্পষ্টতই বহিরাগতদের সুকৌশলী পরিকল্পনায়। ১২ই মে ২০২০ তারিখে হিন্দু দুষ্কৃতীদের আক্রমণের ধরণ দেখে অনুমান করা যায় যে আগে উল্লিখিত একযোগে আক্রমণের পেছনে শারীরিকভাবে আহত করা উদ্দেশ্য ছিল না, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করা।

৩। ফেরীঘাট স্ট্রিট ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়া অন্যান্য এলাকায় হিংসাতে মুসলমানদের জড়িত থাকার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হিন্দুদের সম্পত্তির ওপর আক্রমণে তেলিনিপাড়ার বাইরের কোনো মুসলমান দুষ্কৃতী জড়িত ছিল না বলে জানা গেছে।

৪। এপিডিআর টিম ঘটনার প্রবাহ দেখে বুঝতে পেরেছে, হিংসাত্মক ঘটনায় পুলিশ এক নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি ১০ই মের ঘটনার পর পুলিশ আরো সক্রিয় এবং সতর্ক হত, তবে সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি অনায়াসেই এড়ানো সম্ভব হত। ইচ্ছাকৃতভাবে কিনা বলা যাচ্ছে না, তবে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুধাবন করতে স্থানীয় পুলিশ এবং ইন্টিলিজেন্স ভয়ানকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশ থানার অফিসার-ইন-চার্জকে উত্তরবঙ্গে বদলির ঘটনা এই পর্যবেক্ষণকে নিশ্চিত করেছে।

আশাপ্রদ ঘটনা: শ্রী বিজয় সাউয়ের দোকানের জিনিসপত্র লন্ডভন্ড ও লুঠপাট আটকাতে গিয়ে জনৈক মুসলমান বৃদ্ধা মারা গেছেন। বুড়ো দেওয়ানতলার প্রাক্তন কাউন্সিলর গব্বর তাঁর এলাকার মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের সাথে কথা বলে শান্ত করেন এবং সেই এলাকায় কোনোরকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি। পাইকপাড়ায় হিন্দু গোয়ালারা অত্যন্ত সফলভাবে হিন্দু দুষ্কৃতীদের ১ নং লাইনে ও কাছাকাছি এলাকায় ঢুকতে বাধা দেন।

আমাদের দাবীঃ

১। বিষয়টির সঠিক তদন্ত করা হোক ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

২। এই সমস্ত ঘটনায় ভদ্রেশ্বর থানার ভূমিকা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হোক ও তদন্তে পাওয়া তথ্য জনসমক্ষে আনা হোক। নিয়মভঙ্গকারী পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হোক। বিচার ন্যায়ের পক্ষে হয়েছে, এটা জনগণের দেখা প্রয়োজন।

৩। সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪। এফআইআর বা জিডি কোনোরকমেই প্রত্যাখ্যান করা চলবে না। আক্রমণের শিকার হওয়া সাধারণ মানুষকে এফআইআর করতে সাহায্য করা প্রয়োজন।

৫। শ্যামনগর নর্থ জুটমিলে মুসলমান শ্রমিকদের কাজ দিতে অস্বীকার করার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হোক ও তা সংশোধন করার উদ্যোগ সত্বর নেওয়া হোক।

৬। ক্যাম্পে আশ্রিত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের খাবারদাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হোক যতদিন না প্রশাসন তাদের বাসস্থান পুনর্স্থাপন করছে।

এপিডিআর টিমের সদস্যঃ অমল রায়, বাপি দাশগুপ্ত, কমল দত্ত। অতিরিক্ত খবর সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় ও শক্তিপদ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ফলো-আপ

১। গত ২৬/০৫/২০২০ তারিখে এপিডিআর জেলা কমিটির পক্ষে একটি টিম চন্দননগর কমিশনারেটের কমিশনার শ্রী হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে দেখা করে। সেখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রসঙ্গে এপিডিআরের মতামত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়ঃ

ক। ১২ই মের ঘটনা আটকাতে পুলিশি ব্যর্থতা,

খ। গ্রেপ্তার হয়ে থাক পাঁচজন মহিলা ও রিপোর্টে উল্লিখিত মৃগীরুগী ছেলেটি ও হিন্দু ক্যাম্পে থাকা অভিভাবকহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটির বাবা ও দুই দাদার অবিলম্বে জামিন,

গ। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ বাসস্থানে ফেরার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা।

পুলিশ কমিশনার পুলিশি ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেননি। পাঁচজন মহিলার জামিনের বিষয়টি যথাযথ বিবেচনা করবেন

বলে প্রতিশ্রুতি দেন ও অন্যদের জামিনের বিষয়টি দেখবেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা জমা দিতে বলেন এবং তাদের ফেরানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেবার চেষ্টা করবেন বলেন।

২। ২৯/০৫/২০২০ তারিখে জেলা কমিটির পক্ষে একটি টিম চন্দননগর মহকুমাশাসকের সাথে দেখা করে। আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়:

ক। ক্যাম্পে থাকা মুসলমান ও হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে বাড়ি ফেরানো ও পুনর্বাসন দেওয়া এবং বাড়ি ফেরার পর পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কা দূরীকরণ,

খ। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থা ফেরানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ,

গ। প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও ক্ষতির তুলনায় তা সামান্য এবং পরবর্তী ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব কিনা,

ঘ। পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা,

ঙ। লক-ডাউনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অনাহারে থাকা মানুষের জন্য ত্রাণ।

৩০/০৫/২০২০ তারিখ থেকে পাইকপাড়ার দুটি প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নেওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের শ্যামনগর নর্থ জুটমিলের ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং লেবার লাইনে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। মহকুমাশাসক জানান, বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের আশঙ্কা দূর করার ক্ষেত্রেও প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। মহকুমাশাসক বলেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস ফেরানোর জন্যে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ও বিশিষ্ট মানুষজন ও রাজনৈতিক দলগুলিকে ডেকে কোনো মিটিং করার কথা এখনো ভাবা হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন যে এখনো অবধি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে প্রশাসন কথা বলার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। তিনি জানান যে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক সরকার ঠিক করে দেয়, তাঁর কিছু করার নেই। তিনি আরও বলেন, তাঁর এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়টি এখনো তৈরি হয়নি। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, লক-ডাউনের কারণে অনাহারে থাকা মানুষের তালিকা তাঁকে দিলে তিনি অবশ্যই ব্যবস্থা নেবেন।

গতকাল ৩০.০৫.২০২০ তারিখে পাইকপাড়া ত্রাণ শিবিরে থাকা লেবার লাইনের বাসিন্দা মুসলমানদের লেবার লাইনে ফেরানো হয়েছে।যাদের বাড়ি পুড়ে গেছে,বাড়ি মেরামত করতে না পারায় তারা এখনো শিবিরে রয়ে গিয়েছেন। ক্ষতিপূরণ অপাযপ্ত এবং তা দেওয়ার ক্ষেত্রে চন্দননগর করপোরেশন ও ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালিটি একই ধরনের নীতি নেয়নি।

ভদ্রেশ্বর থানা জানিয়েছে ১৪২ জন গ্রেপ্তার হয়েছে ও ৪টি F.I.R হয়েছে,তার মধ্যে ২ টি প্রশাসন দ্বারা ও দুটি অন্যদের দ্বারা।

সংকট
সর্ব সেনগুপ্ত

মাথার উপর ছাদ নেই,
পায়ের তলায় জমি নেই,
আমি আছি, নাম নেই;
কারণ আমার দেশ নেই,
রাষ্ট্র নেই।
অতি আপন বলতে ছিল — মা, বাবা,
ভাইবোন, পাড়া প্রতিবেশী;
সবাই নিজের।
আজ কে কোথায়, জানা নেই।
ভোটার আমি, ভারতবাসী?
চুপ! বলতে নেই!
মানুষ আমি, এই পরিচয়!
তাতে কি? মুসলমান না হিন্দু?
জানা নেই।
যা জানা আছে —
অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের
অধিকার নেই।
এত নেই এর মধ্যে আছে!
'জাহান্নাম' এর ঠিকানা।

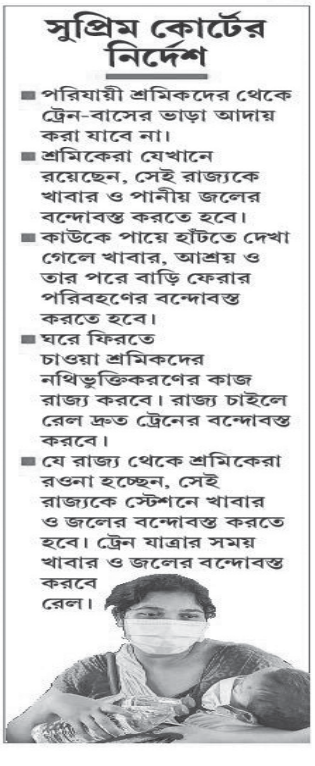

সূত্র: আবাপ, ২৯/০৫/২০২০

সভ্যতার সঙ্কট ও শ্রমিকশ্রেণি

অমিত মুহুরি

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেন, "সব কিছুই আছে, এবং একই সাথে নেই, কেননা সবকিছু প্রবাহমান, নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, নিয়ত জন্ম নিচ্ছে, নিয়ত লোপ পাচ্ছে।" গ্রিক দর্শনের এই অমোঘ উক্তি, মানুষের তৈরি শিল্প বিপ্লবোত্তর সিভিলাইজেশন-এর নিরিখে বলা নয়। প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরা ভুলে গেছিলাম। পারিপার্শ্বিকতার চাপে। আমাদের চারপাশে ঘিরে রয়েছে বিশালাকার মল, মাল্টিপ্লেক্স, বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্টক মার্কেট, মানি মার্কেট, MNC/TNCর আঞ্চলিক সদর দপ্তর। এই সব কিছু রক্ষা করবার জন্য বিশালকায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা, দক্ষ সামরিক ও অসামরিক বিভাগ, অনুগত আমলা বাহিনী আর তার অতি অনুগত কর্মচারীবৃন্দ। সবকিছু সামাল দেবার জন্য অনুগত রাজনৈতিক দল আর তার চেনা-অচেনা শাখা সংগঠন, যারা প্রতিনিয়ত দেশের ভালোর জন্য নিবেদিত। কিন্তু এত বজ্র আঁটুনি, সব তালগোল পাকিয়ে গেল করোনা ভাইরাস-এর আগমনে। আর আসল ভারতবর্ষের চেহারা দেখা গেল ২৮ মার্চের সকালবেলা, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে দিল্লি র আনন্দ বিহার স্টেশন ও বাস টার্মিনাল ভরে উঠল। তাদের একটাই ছোট দাবি, তারা দেশে ফিরতে চায়। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের চেয়েও তাদের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে অনাহার আর দিল্লি পুলিশের অত্যাচার। বাড়ি ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালা উৎখাত করে দিয়েছে অনেককে। করোনা ভাইরাসের জন্যে লক-ডাউন ভেঙে এত মানুষের হঠাৎ উদয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিস্মিত। তাদের বিশাল গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে কোনও আগাম তথ্য ছিল না। প্রশ্ন উঠল, এত লোক কোথায় ছিল? এরা কারা?

'Periodical labour force survey (PLFS)'-এর একটি প্রতিবেদন 2017-18 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে, যে সমগ্র দেশ জুড়ে, মূলত বড় শহরগুলোতে ৯৩ মিলিয়ন বা ৯ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক যুক্ত আছে মাত্র পাঁচটি সেক্টরের সঙ্গে। করোনা ভাইরাসের আক্রমণ কেড়ে নিয়েছে তাদের জীবন ও জীবিকা। এই পাঁচটি সেক্টর হল — ১) ম্যানুফ্যাকচারিং (২৪ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মরত), ২) ব্যবসা, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট (৩২ মিলিয়ন), ৩) নির্মাণকার্য (১৫ মিলিয়ন), ট্রান্সপোর্ট, স্টোরিং ও কমিউনিকেশন (১১ মিলিয়ন) এবং ফাইনান্স বিজনেস ও রিয়েল এস্টেট (৭ মিলিয়ন)। এই সমস্ত শ্রমিকদের সর্বাধিক (৫০ শতাংশ) স্বনিযুক্ত, ২০ শতাংশ ক্যাজুয়াল আর ৩০ শতাংশ মাসিক মজুরিতে বা চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন। কিন্তু অন্য কোনও বিশেষ সুবিধা পান না। যেমন, পিএফ, ইএসআই, ছুটি, ইত্যাদি। করোনা ভাইরাস এদের জীবনের যে সামান্য আশটুকু পড়ে ছিল তাও শেষ করে দিল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি কর্মরত শ্রমিক কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। তারপর এই কর্মীগোষ্ঠী দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই ৯৩ মিলিয়ন সংখ্যাটা জাপান, অষ্ট্রেলিয়া বা বৃটেনের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এই ৯৩ মিলিয়ন-এর বাইরে কিছু শ্রমিক-কর্মচারী আছে যারা বিভিন্ন অফিসে কাজ করে। যদিও এদেরকে সংগঠিত শিল্পর মধ্যে ফেলা হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ un-registered। এই মূহুর্তে তাদের কোনও চাকরি আছে কিনা সন্দেহ। করোনার প্রকোপ চলে যাওয়ার পর ফিরে পাবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

অনেক মানুষ আছে যারা রাস্তায় ফেরি করে, কেউ খাবার বিক্রি করে, কেউবা জামাকাপড় বিক্রি করে, তাদের অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে দেশে ফিরে গেছে বা যাবার চেষ্টায় আছে। যারা দৈনিক মজুরিতে বা ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল তারা খুবই সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে ছবিটা ক্রমে ধূসর থেকে ধূসরতর হচ্ছে।

লক-ডাউন ঘোষণার পর এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বা ৩০ দিনে দেশে মোট ১৪ কোটির মতন শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (CMIE) এক সমীক্ষায় জানিয়েছে এই তথ্য। তারা এও জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতির জন্য আগেই বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এখন সব ছাড়িয়ে গেছে। মার্চে ছিল ২৩.৮, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬.৮ শতাংশ।

করোনা ভাইরাসের আক্রমণের আগে এই দেশে ৪০৪ মিলিয়ন বা ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ কর্মরত ছিল। এক ধাক্কায় তা কমে হয়েছে এই সময়ে ২০ কোটি ৮৫ লক্ষ।

অথ্যাৎ ১১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের (১১৯ মিলিয়ন) আর চাকরি নেই।

ILOর তথ্য বলছে সারা বিশ্বের পাঁচজন মানুষের মধ্যে চার জন আজ এই করোনা ভাইরাসে হয় সরাসরি নয় আংশিক ভাবে খতিগ্রস্ত। এই সংখ্যাটা বিশ্বজুড়ে সমগ্র শ্রমিক কর্মচারীর ৮১ শতাংশ। সমগ্র বিশ্বজুড়ে অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২ বিলিয়ন বা ২০০ কোটি। সমগ্র কর্মীর প্রায় ৬১ শতাংশ। যার অধিকাংশই আমাদের মতন উন্নয়নশীল দেশের। তারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত আজ।

এই মুহূর্তে দেশের মোট বেকারত্বের একটা সাধারণ পরিসংখ্যান হল ২৮ শতাংশ। এটাই সর্বকালের সর্বোচ্চ।

গত বছর ৩০ নভেম্বর সরকার নিজেই জানিয়েছিল যে বিগত ছয় বছরের মধ্যে সর্বোনিম্ন আর্থিক বৃদ্ধি ঘটেছে — ৪.৫ শতাংশ। অন্যদিকে এই ২০২০ সালের মার্চ মাসে ১৫ বিলিয়ন ডলার পুঁজি নিঃশব্দে দেশের অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে যায়। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কোনও আস্থাই আর যে মোদী সরকারের ওপর নেই। করোনা ভাইরাসের আগেই দেশের আর্থিক ব্যবস্থা বেহাল হয়ে গেছিল। এর ফলে বর্তমানে ভারতীয় মুদ্রার চূড়ান্ত অবমুল্যায়ন হয়েছে।

দ্বিতীয়বার লক-ডাউনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, কারখানার মালিকরা যেন লক-ডাউন চলাকালীন প্রাপ্য বেতন শ্রমিকদেরকে দিয়ে দেয়। বাড়ির বা বস্তির মালিকদের অনুরোধ করলেন তারা যেন কাউকে ভাড়া দিতে না পারার জন্য উৎখাত না করে। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে কতজন সাড়া দিয়েছে জানা যায় না।

এই প্রসঙ্গে টিম লিজের চেয়ারম্যান মণীশ সাভরওয়াল বলেন – "প্রধানমন্ত্রীর জানা উচিত সবাই টাটা, বিড়লা বা আম্বানির সংস্থায় কাজ করে না। ছয় কোটির বেশি ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থার মধ্যে ৯৮ শতাংশ সংস্থার কর্মীসংখ্যা ১০ জনেরও কম। এরা কোথা থেকে বেতন দেবেন? এদেশে ব্যবসা করতে গেলে ৫৭ হাজার নিয়ম কানুন মানতে হয়, ৩১০০ নথি জমা দিতে হয়। এখানে গড়ে দিনে আটবার নিয়ম বদলায়। এতে ছোট বড় মাঝারি সংস্থার জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠেছে।" NASCOM-এর প্রেসিডেন্ট দেবযানীর দাবি, "আগামী দুই-তিন বছরের জন্য ছোট ও মাঝারি শিল্প ও স্টার্ট-আপগুলোকে সমস্ত রকম নিয়মকানুন থেকে ছাড় দেওয়া হোক।" সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করার পর যে সত্যটা সামনে আসে, তা হল বৈষম্য, অমানবিকতা ও অনৈতিকতার এক যোগফল মাত্র।

এই বিশ্ব আর আমাদের দেশ

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফ্যাম-এর রিপোর্ট অনুসারে ভারতে ৯৫.৩ কোটি (প্রায় ৭৭ শতাংশ) নাগরিকদের মোট সম্পত্তির চারগুণেরও বেশি সম্পত্তি রয়েছে মাত্র ৬০জন ধনকুবেরের হাতে! ঐ রিপোর্টে 'Time to care' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ৬০টি পরিবারের মোট সম্পদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৪৪২২০০কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বাজেটের চেয়েও বেশি। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের মোট সম্পদের পরিমাণ ৮৮২ লক্ষ কোটি টাকা। আর তার ৭৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬৬১ লক্ষ কোটি টাকা রয়েছে দেশের ধনীতম ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে। যদি সরকার মনে করেন দেশের মানুষের সত্যি ভালো করবে, তাহলে তাদের ওপর মাত্র ২ শতাংশ হারে সম্পদ করে বসালেই প্রায় ১৩.৩ লক্ষ কোটি টাকা আদায় হবে। এই বিশাল অর্থ সাময়িক ভাবে লক্ষ লক্ষ কর্মহীন মানুষকে অক্সিজেন জোগাতে পারে। অবশ্য যদি টাকার সমবন্টন হয়।

অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতিতেও ছবিটা এক। বিশ্বের এক শতাংশ ধনীতম ব্যক্তির মোট সম্পদের পরিমাণ ৬৯০ কোটি মানুষের সম্পত্তির দ্বিগুণ। বৈষম্য গত তিন দশকে যা বেড়েছে তা অকল্পনীয়। বর্তমানে বিশ্বের মাত্র ২,১৫৩ জন ধনকুবেরের হাতে যা সম্পদ আছে, তা ৪৬০ কোটি বিশ্ববাসীর সম্মিলিত সম্পত্তির থেকেও বেশি।

প্রকৃতির মার ও ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার স্বরূপ

উপরে উল্লেখিত তথ্য ও পরিসংখ্যান স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে বিশালাকার বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কত ঠুনকো। হাজার অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত দেশগুলো আর তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কত ঠুনকো। আমাদের দেশের রাজধানীর বুকে যখন লক্ষ লক্ষ লোক বাড়ি যাওয়ার আশায় রাস্তায় নেমে আসে তখন এই ব্যবস্থার নগ্ন রূপ বেরিয়ে আসে। তখন কারো মনে হতে পারে, ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

গ্রিক দার্শনিকের সেই কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলা যেতেই পারে, সব কিছু আছে আবার কিছুই নেই। চলমান জীবন হঠাৎই থমকে যায় এখানে। পৃথিবীতে সব কিছু যে পরিবর্তনশীল তা মনে পড়ে। জমির ওপর কিছু মানুষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারে। পৃথিবীর ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখনও মানুষ করতে পারেনি। আমাদের জীবনযাপনের যা কিছু আছে সবই মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে তৈরি করেছে। প্রকৃতি থেকে আহরণ করে নিয়েছে। মানুষ যে প্রকৃতির সন্তান, তার শরীরের ভিতরে ভাইরাসের আশ্রয় নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। করোনা ভাইরাসও প্রাকৃতিক। যতই ডোনাল্ড ট্রাম্প চিৎকার করুক। প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্তনীয়। এই পৃথিবীর কয়েকশো কোটি মানুষ যে খুব অসহায় তা আজ স্পষ্ট, দিনের আলোর মতন। এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব যদি পৃথিবীর মানুষ লগ্নি পুঁজি (finance capital) ও একচেটিয়া পুঁজি (monopoly capital) থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। সমাজতন্ত্রই পারে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখলদারদের হাত থেকে প্রকৃতিকে মুক্ত করতে। ইকলজি, বায়োডাইভার্সিটি, বা পরিবেশ রক্ষার কাজ সমাজতন্ত্রেই সম্ভব।

লেনিনের রাজত্বে কারও চাকরি যেত না

এই লেখা চলাকালীন জনৈক অর্থনীতিবিদ শ্রমিকদের এই কাজ চলে যাওয়া এবং আবার ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করলে, যা জবাব দেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "This is not Lenin's Russia, where all jobs were under the control of state. In India demand and supply decide job availability. There is no need for pro-

spective employer to tell the government whether jobs are available." লেনিনের রাশিয়াতে চাকরিগুলো ছিল রাষ্ট্রের অধীনে। রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে কোনও দায়িত্ব নেবে না, তা আজ প্রমাণিত। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের বাড়ি ফেরার কোনও ব্যবস্থা না করা অথবা তাদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসার কোনও দায়িত্ব গ্রহণ না করা, এই অমানবিকতা একমাত্র ক্যাপিটালিস্ট অথবা ছদ্ম সমাজতান্ত্রিকরা দেখাতে পারে। সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিকরা এটা করবে না।

এখন একটু দেখা যেতে পারে লেনিনের রাশিয়ার অবস্থা কেমন ছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ১৯১৮ থেকে ১৯২০ গৃহযুদ্ধে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সম্পদের এক-চতুর্থাংশকে বিনষ্ট হয়েছিল। আয় নেমে এসেছিল এক-তৃতীয়াংশে। অধিকাংশ কলকারখানায় কোনও কাজ হচ্ছিল না। ভারি শিল্প সাঙ্ঘাতিক রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, বিপ্লবের আগে ভারি শিল্পের যে উৎপাদন হত ১৯২০ সালে তা নেমে এসে দাঁড়ায় এক-সপ্তমাংশে। ইস্পাত গলানোর কাজ নেমে আসে মাত্র পাঁচ শতাংশে। পরিবহন ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই অকেজো হয়ে যায়। তার ফলে দেশের আর্থিক সংহতি বিনষ্ট হয়। তাছাড়া পরিবহন ব্যবস্থার বিপর্যয়, খাদ্য সংকট, বুভুক্ষা, বিশৃঙ্খল অবস্থার তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধে দু'কোটির বেশি প্রাণক্ষয় হয়েছিল। এই প্রাণক্ষয় ছিল মোট জনসংখ্যার এক সপ্তমাংশ। কর্মক্ষম লোকজনের শতকরা ২০ জন প্রাণ হারিয়েছিল। এর পরেই লেনিনের সৃষ্ট New Economic Policy (NEP) প্রয়োগ হয়। তার ফলে সোভিয়েত রাশিয়ায় তৈরি হয়েছিল আর্থিক উন্নতির সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক সুষম হার। তবুও বেকারি বৃদ্ধি হচ্ছিল। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২৪,০০০। ১৯২৬ সাল থেকে বেকারি হ্রাস পেতে থাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে। কিন্তু ১৯২৮ সালের কৃষি সঙ্কটে কৃষকরা শহরে চলে আসে, ফলে বেকারত্ব আবার বেড়ে যায়। তবে নব শিল্পায়ন-এর ফলে সবাই কিছুদিনের মধ্যে চাকরি পেয়ে যায়। ১৯৩০ সালে সোভিয়েটে আর কোনও বেকার ছিল না।

ধনতন্ত্রে সবাই চাকরি পাবে এটা কখনো হতে পারে না। ফুল এমপ্লয়মেন্ট হলে মজুরির প্রশ্নে শ্রমিকদের দাবি মালিকেরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। শ্রমিকরা যাতে কোনও দাবিদাওয়া নিয়ে বেশি দর-কষাকষি না করতে পারে তার জন্য বাজারে বেশ কিছু বেকার রাখতে হয়। এই ব্যধি থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। প্রকৃতির ওপর এবং বাজারের ওপর শুধুমাত্র বলশালীদের দখলদারি থাকবে এটা আর চলতে পারে না।

তাহলে এরপর কী হবে?

করোনা ভাইরাস পরবর্তী পৃথিবী আগের মতন থাকবে না অনেকে বলছে। কিন্তু সেই পরিবর্তন এখনই হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক বছর বেকারী, দূর্ভিক্ষ, ছোটখাটো লড়াই মহামারী চলতে থাকবে। একচেটিয়া পুঁজি আরও কেন্দ্রীভূত হবে। সদ্য প্রকাশিত আইএলওর রিপোর্ট বলছে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিশ্বের মোট ১৬০ কোটি মানুষ কাজ হারাবে। পাশাপাশি আরও একটা রিপোর্ট উঠে এসেছে, তা হল, লক-ডাউনের জেরে প্রায় ৪৩ কোটি ছোট সংস্থা ডুবে যেতে পারে। এই ৪৩ কোটি সংস্থার জায়গা অবশ্যই কোনও মাল্টিন্যাশনাল বা ট্রান্সন্যাশনাল করপোরেশন নেবে। একচেটিয়া পুঁজি আরও সুসংহত হবে। ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় বাজার ছোট হবে, অন্যদিকে একচেটিয়া পুঁজি তার rate of profit বজায় রাখতে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে যাবে। এই স্ট্যাগফ্লেশন থেকে বের হতে যে ধরনের উন্নত মানসিকতার প্রয়োজন তা বর্তমান নীতি নির্ধারকদের নেই। নেই বলেই বিদেশি পুঁজি ক্রমশ চলে যাচ্ছে। মার্চ এবং এপ্রিল মাসেও 'foreign portfolio investor' (FPI)-রা যথাক্রমে ১.১ লক্ষ কোটি টাকা এবং ১৫,৪০৩ কোটি টাকা ভারতের বাজার থেকে তুলে নেয়। পরিসংখ্যান ও নীতি নির্ধারকদের দিকে তাকিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে অবস্থার কোনও উন্নতি সম্ভব নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান তুর্কীদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায় ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলোর হাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শাসন করার ক্ষমতায় চলে আসে আমেরিকা ও রাশিয়া। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দ্বিমেরু বিশ্ব পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। তারপর থেকে আমেরিকা অনেকটা একক ভাবে পরিচালনা করছে। কিন্তু খুব ধীরে অথচ নিরবে চিন বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বিশ্বের বাজারে নিজের আধিপত্য কায়েম করেছে। করোনা ভাইরাস অধ্যায় শেষে চিন নতুন শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে অবশ্যই বিনা বাধায় নয়। এক্ষেত্রে গ্রিক হারকিউলিস যেমন বলেছিলেন, "যুদ্ধ, হ্যাঁ, যুদ্ধই শেষ কথা।"

সভ্যতার জীবনচক্র

একটা নিষ্ঠুর ছবি এঁকে এই লেখা শেষ করা যাক। প্রতিটি সিভিলাইজেশন-এর একটি লাইফ সাইকল হয়। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী টমাস কোল-এর পাঁচটা পেইন্টিং পরপর সাজানো আছে নিউ ইয়র্ক-এর হিস্টরিক্যাল সোসাইটির গ্যালারিতে। প্রতিটি ছবি আঁকা হয়েছে কল্পনায় একটি বিশাল নদীর মুখে। তার নীচে আর চার পাশে উঁচু নিচু পাথরের স্তর। প্রথম ছবিটায় কিছু আদিম মানুষ এক বিশাল পাথরের ফাঁকে আশ্রয় নিয়েছে, বৃষ্টিস্নাত এক ভোরে, জঙ্গলের মধ্যে। দ্বিতীয় ছবিটি, কৃষিকাজ শুরু হবার সময়। অধিবাসীরা সব মাঠ পরিস্কার করছে, গাছ কাটছে। গ্রিক দেবীর মন্দির বানাচ্ছে। তৃতীয় ছবিটি সবচেয়ে বড়। 'Consummation of Empire'। পুরো ল্যান্ডস্কেপ এখানে দামি মার্বল পাথরে মোড়া। আগের ছবিতে

থাকা চরিত্রগুলো বদলে গেছে। আগের ছবির কৃষক দার্শনিক পুরোহিত এখানে হয়েছে সুন্দর পোশাকে সজ্জিত ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী এবং নাগরিক-ভোক্তা। চতুর্থ ছবি: ধ্বংস। নগর জ্বলছে, নাগরিকবৃন্দ পালাচ্ছে। নতুন এক শক্তি নগরে প্রবেশ করেছে। সন্ধ্যার আকাশ আগুনের আভায় লাল হয়ে গেছে। শেষ ছবি: আকাশে চাঁদ উঠেছে। পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে সমস্ত চরাচর। কোনও জীবিত প্রাণী দেখা যাচ্ছে না। ক্ষয় হওয়া, ভেঙে পড়া বিশাল প্রাসাদগুলোর চারপাশে গুল্ম আর আইভি লতা।

কমবেশি সব সমাজবিজ্ঞানী এক ব্যাপারে সহমত যে সিভিলাইজেশনের উত্থান আছে, ধ্বংসও অনিবার্য। Polybius, Ibn Khaldum, Giambattsta Vico, Henry St John, Viscount Bolingbroke, Arnold Toyenbee থেকে শুরু করে Paul Kennedy পর্যন্ত অনেকেই সে কথা মনে করেন। সবার লেখায় ভিন্নতা থাকলেও পরিসমাপ্তি ঘটেছে শ্মশানের নিরবতা দিয়ে। এ ব্যাপারে সবাই একমত। আমেরিকান ঐতিহাসিক Carroll Quigley জর্জ টাউন ফরেন সার্ভিস স্কুলে পড়াতেন। তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। তিনি এই প্রসঙ্গে সুন্দর ভাবে বলেছেন – "a process of evolution… each civilisation is born... and... enters a period of vigorous expansion, increasing its size and power... until gradually a crisis of organization appears. When the crisis has passed and the civilization has been reorganized... Its vigor and morale have weakened. It becomes stabilized and eventually stagnant. After a Golden Age of Peace and prosperity, internal crisis again arises. At this time there appears, for the first time, a moral and physical weakness which raises... questions about the civilisation's ability to defend itself against external enemies.... The civilisation grows steadily weaker until it is submerged by outside enemies... and eventually disappears.

ঘটনাপ্রবাহ ৩:

বিপন্ন পরিবেশ

আবাসন থেকে সিমেন্ট–বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ার আগে পরিবেশগত সমীক্ষায় লক-ডাউনের মধ্যেই বিপজ্জনক একগুচ্ছ 'ছাড়'-এর প্রস্তাব দিল কেন্দ্রীয় সরকার। কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবেশগত সমীক্ষা প্রয়োজন এবং কী ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হবে, তার গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ২০০৬-এর এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) নোটিফিকেশনে। সেই নির্দেশিকায় বদল আনতে চেয়ে খসড়া তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক। সেই খসড়ার ধাপে ধাপে বিপদের ফাঁদ।

অনেকগুলি শিল্পকে পরিবেশগত সমীক্ষার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। ফলে সেই শিল্প গড়ার সময় সাধারণ মানুষের কী ক্ষতি হতে পারে, তার আর কোনও সমীক্ষাই হবে না। এ ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের আপত্তি বা অভিযোগ জানানোর জন্য যে জনশুনানি করা হত, তারও পরিসর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যখন গোটা দেশ করোনায় ত্রস্ত, তখন চুপিসাড়ে এই খসড়া প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। এমনিতেই লক-ডাউনের জেরে বিশেষ করে সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ প্রবল উদ্বেগে রয়েছেন। খসড়া নির্দেশিকায় যে ভাবে শিল্পসংস্থাগুলিকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তাতে সিমেন্ট, আবাসন, খনি শিল্পের মতো ক্ষেত্রে পরিবেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগেরও বস্তুত আর কোনও মূল্য থাকবে না।

৫০ হাজার থেকে দেড় লক্ষ বর্গমিটার আয়তনের আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এতদিন পরিবেশ সমীক্ষা করিয়ে ছাড়পত্র নিতে হত। খসড়া প্রস্তাবে তা শিথিল করে বলা হয়েছে ওই ধরনের আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'গ্রিন সার্টিফিকেট' থাকলেই হবে। তার জন্য পরিবেশগত সমীক্ষা করতে হবে না। পাঁচ হেক্টর পর্যন্ত লিজ এলাকায় খনিজ উত্তোলন, ২৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ৫ থেকে ১৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত বায়োমাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এক থেকে দেড় লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম ফাউন্ড্রিকেও পরিবেশগত সমীক্ষার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি সিমেন্ট কারখানা, বছরে ১০ লক্ষ টন উৎপাদনকারী গ্রাইন্ডিং ইউনিট, ওয়াটার এরোড্রোম, বাণিজ্যিক হেলিপোর্টের মতো ক্ষেত্রেও পরিবেশগত সমীক্ষা করতে হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, জনশুনানির পরিসরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও শিল্পের ৫০ শতাংশ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও পরিবেশগত সমীক্ষা করাতে হবে না বলে খসড়ায় বলা হয়েছে। ফলে কেউ পরিবেশবিধি অমান্য করে নির্মাণ করলে সেটি আইনি ভাবে ভেঙে ফেলাও কঠিন হবে। স্রেফ জরিমানা দিয়ে নিস্তার পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

করোনা-পরিস্থিতির মধ্যেই রাজধানী পুনর্গঠনে কেন্দ্রের ২০ হাজার কোটি টাকার 'সেন্ট্রাল ভিস্তা' প্রকল্পের কাজও ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। বিপর্যস্ত দিল্লির পরিবেশে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলবে এই প্রকল্প এবং ঐতিহ্যহানিরও সমূহ আশঙ্কা। অথচ লক-ডাউনের মধ্যে কেন্দ্রীয় পূর্ত এবং পরিবেশমন্ত্রক চুপিসাড়ে প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। নগরোন্নয়ন মন্ত্রক নয়াদিল্লির ভূমি ব্যবহার-বিধিতে তড়িঘড়ি বদল এনে প্রকল্পের পথ পরিষ্কার করেছে। নতুন সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতির নতুন বাসভবন, সব মন্ত্রীদের অফিস-সহ গুচ্ছ সরকারি কার্যালয় নির্মাণ, ঐতিহ্যশালী নর্থ ও সাউথ ব্লকের অদলবদলের পরিকল্পনা রয়েছে এই মেগা-প্রকল্পে। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত সাড়ে তিন কিলোমিটার পথের দু'ধারে ৮৬ একর জুড়ে হবে নির্মাণ-কাজ। সাধারণের ব্যবহারের পার্ক, ফাঁকা জায়গা আর নয়নাভিরাম সবুজে কোপ পড়বে। সেই মতোই বদলানো হয়েছে ভূমি ব্যবহার-বিধি।

লক-ডাউন: বিক্ষোভ এবং পুলিশের লাঠিচার্জ ও নির্যাতন

অনুবাদক : শঙ্কর দাস

প্রায় দু মাস হতে চলল অপরিকল্পিত লক-ডাউন এর জেরে সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে, ভিন রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকরা, যে অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হচ্ছেন তা এককথায় অভূতপূর্ব। এই বিপুলসংখ্যক শ্রমিকরা যারা বৃহত্তম দেশ মেক ইন ইন্ডিয়ার সোপান। যাঁদের যথাযথ পরিসংখ্যানও রাষ্ট্রের কাছে নেই!

কোথাও কোথাও তারা রাষ্ট্রের অবর্ণনীয় পাশবিক বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন, আবার তা করতে গিয়ে কখনও পুলিশের বর্বর লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে চারটি পর্যায়ে লক-ডাউন এ শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও তাদের উপর পুলিশি নিপীড়নের একটি পরিসংখ্যান দেখে নেওয়া যাক

২৩- শে মার্চ:

বেঙ্গালুরু, মাগাদি মেইনরোড অবস্থিত, শাহী ফ্যাক্টরি ৪- নম্বর ইউনিটের শ্রমিকরা তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখান ম্যানেজমেন্ট ৩১শে মার্চ, পর্যন্ত তাদের তাদের সবেতন ছুটিতে পাঠান।

২৭শে মার্চ:

শতাধিক শ্রমিকরা কেরালার কোট্টায়াম, পায়িপাড়ুতে পথে নেমে পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাড়িতে ফেরার দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

এদিন রাতে পান্ডেসারা এলাকার, গণেশ নগর, তিরুপতি নগরে শ্রমিক বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি চলে ও শ্রমিকরাও ইট-পাটকেল ছোড়েন। জন শ্রমিক এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হন এবং পরে ছাড়া পান।

৩০- শে মার্চ :

কেরালার -এর্নাকুলাম জেলার, পেরাম্বুরে পাঁচ শতাধিক ভিন রাজ্যের শ্রমিক বাড়ি ফেরার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

১০-ই এপ্রিল;

সুরাটে এক স্বতস্ফুর্ত প্রতিবাদে অসংখ্য ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা রাস্তা দখল নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং তারা রাস্তায় বেশ কিছু ঠেলাগাড়ি ও গাড়ি ঘোড়া জ্বালিয়ে দেন।

১১- ই এপ্রিল;

দিল্লির কাশ্মীর গেটের কাছে শ্রমিকদের একটি আবাসনে আগুন লেগে যায়। খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য তারা দাবি তোলেন পরে তাদের যমুনা নদীর তীরে খোলা জায়গায় খাবার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই থাকতে বাধ্য করা হয়। পুলিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করে।

১২- ই এপ্রিল;

মাদুরাই এমজিআর স্ট্রিটে, দৈনিক রোজের (ডেইলি লেবার) শ্রমিকরা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কেনার পয়সা নেই জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

১৩- ই এপ্রিল;

ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেনারেল হাসপাতালের নার্সরা অসুরক্ষিত কাজের পরিবেশ এবং জোর করে কাজ করানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান পর্যাপ্ত স্যানিটাইজেসন ও স্বাস্থ্য মানের দাবি করেন।

১৪- ই এপ্রিল:

মহারাষ্ট্রের থানের, মুম্প্রাতে শতাধিক ভিন- রাজ্যের শ্রমিক তারা আর বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না, তাদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এই দাবিতে রাস্তায় নেমে আসেন।

ঐদিন কয়েক হাজার শ্রমিক বান্দ্রা স্টেশন চত্বরে জমা হয়ে বাড়ি ফিরে যাবার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠেন, পুলিশ তাদের উপর অমানবিক লাঠিচার্জ করে।

লক-ডাউন - দ্বিতীয় পর্যায়: (১৫ই এপ্রিল থেকে ৩-রা মে)

১৫- ই এপ্রিল:

সুরাটের ভারাচ্চা এলাকায় শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়।

ঐদিন চিকিৎসাধীন রোগীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, মুম্বাইয়ের আর এন কুপার, মিউনিসিপাল হাসপাতালের নার্সরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুরক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

১৭ই এপ্রিল:

ট্রেড ইউনিয়ন গুলি, লক-ডাউন এর মধ্যে জুট মিলের বকেয়া মাইনে দাবীতে কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ দেখান।

২৮শে এপ্রিল:

লক-ডাউন পিরিয়ডে ডায়মন্ড বাউড়সের শ্রমিকরা জোড় করে আটকে রাখা ও কাজ করানোর বিরুদ্ধে ও নিজের রাজ্যে ফিরে যাবার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

২৯শে,এপ্রিল:

দুই হাজারের বেশি ভিন -রাজ্যের শ্রমিক, হায়দ্রাবাদের তিন মাসের বকেয়া মজুরি এবং নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। খবরে প্রকাশ বিক্ষোভকারীরা পাথর ছোড়েন ও কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন।

৩০শে, এপ্রিল:

কেরালার মাল্লাপুরমের, চাট্টিপারাম্বুতে শতাধিক শ্রমিক নিজ

রাজ্যে ফিরে যাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

১লা মে:

চারশোরও বেশি ঠিকা শ্রমিক গোটা মার্চ মাসের মাইনের দাবিতে, রাজস্থানের নিমরানা, বেহরোর গ্লোবাল স্পিরিট কোম্পানির গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

২-রা মে:

ঘরেফিরেযাবারদাবিতেচেন্নাই-এরভালাচেরি,গুইন্ডি,মোগপ্পির,ও পাল্লাভরমে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরে।

৩-রা মে:

সহস্রাধিক নির্মাণ শ্রমিক ব্যাঙ্গালোরের বোমানহাল্লী মেট্রোর সামনে খাবার, বকেয়া মজুরি ও ঘরে ফেরার দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং জানা যায় তারা পাথর ছুড়ে বহু সম্পত্তি নষ্ট করে।

ঐদিন হায়দ্রাবাদ তৌলিচৌকিতেও বকেয়া মজুরি, খাবার ও ঘরে ফেরার দাবিতে বিক্ষোভ হয়।

মধ্যপ্রদেশের বারাউনি সেন্ধোয়াতেও বিশাল সংখ্যক ভিন -রাজ্যের শ্রমিক জাতীয় সড়ক অবরোধ করে, পাথর ছুড়ে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনায় ৪০০ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা রুজু করে।

লক-ডাউন - তৃতীয় পর্যায় (৪-ঠা মে থেকে ১৭-ই মে)

৪-ঠা মে;

সুরাট কাদোদরা তেহেসিলের নিকট ভারেলি মার্কেটের সামনে ডাইং টেক্সটাইল ইউনিটের ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা ঘরে ফেরার দাবিতে, পাথর ছুড়ে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ লাঠি ও টিয়ার গ্যাস চালায়।

পালানপুর পাটিয়া এলাকাতেও শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখায়।

শতাধিক ভিন রাজ্যের শ্রমিক আমেদাবাদে জমা হয়ে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সব সময় পাওয়া না যাওয়াতে, ছাপানো ফরমের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

কেরলের -কালিকট জেলার, নান্দিতেও বিক্ষোভের খবর মেলে। অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন এবং নিজের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার দাবিতে সোচ্চার হন। তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিহারের শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন, বাতিল হয়ে যাওয়ায় খবর শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পুলিশ ছত্রভঙ্গ করতে শ্রমিকদের উপর পাশবিক লাঠিচার্জ করে। যদিও পুলিশ লাঠিচার্জের দাবি মানতে চায়নি। শ্রমিকরা তাদের খাবার না পাওয়ার কথা জানান।

তামিলনাড়ু, কোয়েম্বেডু, চেন্নাই কোভিড নাইনটিন কেস শহরে বেড়ে যাওয়ায় কোয়েম্বেডু মার্কেট বন্ধ হয়ে যায়। শহরের শ্রমিকরা বিভিন্ন রাস্তা দখল নেয় এবং তাদের নিজেদের রাজ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এখানে শ্রমিকদের বেশিরভাগটাই মার্কেটে লোডিং এবং আান লোডিং -এর কাজ করেন। তারা থানার সামনে বিপুল সংখ্যায় জমা হয়ে বিক্ষোভ দেখান।

একই রকম অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, আমিনিজিকারি, তাম্বারাম, পল্লাভারাম এবং আম্বাতুরে।

বিহার ঝাড়খন্ড পশ্চিমবঙ্গ থেকে & কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিকরা বাড়িতে ফেরার ছুটি না পেয়ে বিক্ষোভ দেখান। তিরুনেলভেলি জেলার কুদানকুলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের

& সাইটেও নির্মাণ শ্রমিকরা বেতনে ও খাদ্যের দাবিতে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন।

অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরীর কভভুড়ে নিজের রাজ্যে ফেরার দাবিতে শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করলে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। শ্রমিকরা ইটপাটকেল ছোড়েন এবং পুলিশও লাঠি চালায়। হায়দ্রাবাদ শাইকপেটে, লাক্সারি হোম প্রজেক্টর নির্মাণ শ্রমিকরা দু -মাসের বকেয়া মাইনে দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

গুরগাঁও গল্ফ কোর্সা রোডের,(সেক্টর-৫৪গুরগাঁও)সান সিটি টাউন শিপের, নির্মাণ শ্রমিকরা ঘরে ফেরার দাবীতে বিক্ষোভ দেখান।

কয়েক হাজার BIEC কোম্পানির শ্রমিকরা বেঙ্গালুরুর তামাকুরু হাইওয়ে অবরোধ করে এবং বাড়ি ফেরা যাবার দাবি জানায়।

৫- ই মে,

মহারাষ্ট্র, নবী মুম্বাইয়ের পুলিশের বিরুদ্ধে, শ্রমিকদের নানাভাবে বিরক্ত এবং হয়রানি করার অভিযোগ করা হয়।

কর্নাটক, বাড়ি ফিরতে চান শ্রমিকরা অনলাইন পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করতে না পেরে, হেব্বাগড়ি পুলিশ স্টেশনে সকলে অভিযোগ করতে গেলে, পুলিশ সোজাসুজি জানিয়ে দেয় তারা এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করবে না। এমন অভিযোগ অন্যান্য জায়গার শ্রমিকরাও করেন। এমনকি হেব্বাগড়ি থানার পুলিশ, শ্রমিকদের উপর লাঠিচার্জ ও শারীরিক হেনস্থা করে। এবং একজন শ্রমিকের মোবাইল নর্দমায় ফেলে দেয়।

৭-ই মে, কেরালার তিন জেলায়, কান্নুড়, মালাপুরাম ওএরনাকুলামে শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

কর্ণাটক ২ ভিন-রাজ্যের শ্রমিক এবং চিকিৎসার জন্য যাওয়া পেসেন্টদের পরিবারের সদস্যদের সাথে বেঙ্গালুরু পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়।

করোনা-সঙ্কটে জেলখানা এবং বন্দির অধিকার

এপিডিআর প্রতিবেদন

জীবনের নিরাপত্তা, সুরক্ষাই যদি দিতে না পারে সরকার, তা হলে কোন অধিকারে কাউকে গারদে ঢোকায়! কেন বন্দির জামিনের বিরোধিতা করে সরকারপক্ষ? বন্দিকে মানুষ না ভেবে স্রেফ অপরাধী ভাবার অসুখ যেখানে গভীরে, 'সংশোধনাগার' তকমার কি মূল্য?

এ প্রশ্ন দেশের শীর্ষ আদালতের। হ্যাঁ, সেই সুপ্রিম কোর্টের, যে প্রতিষ্ঠান ইদানীং ক্রমান্বয়ে সরকারের মনোরঞ্জনেই বেশি ব্যস্ত। প্রশ্নটা অবশ্য তিন বছর আগেকার এবং এমন দুই বিচারপতির (এখন অবসরপ্রাপ্ত), সরকারের সঙ্গে যাঁদের খাতিরদারির কথা বিশেষ শোনা যায় না। সারা দেশে জেলখানার দুর্বিষহ হাল নিয়ে মামলায় (ডব্লিউপি (সি) ৪০৬/২০১৩) ২০১৭-র ১৫ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী এক রায়ে বন্দিদের সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিচারপতি মদন বি লোকুর ও বিচারপতি দীপক গুপ্তের বেঞ্চ। নির্দিষ্ট ভাবে ওই রায় ছিল বন্দিশালায় অস্বাভাবিক প্রতিটি মৃত্যুতে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত। সব হাইকোর্টে এ বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা শুরুর কথাও বলা হয়েছিল। ওই রায়ের সূত্র ধরেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর) চিঠি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। হাইকোর্টে সে মামলায় সমিতি আগাগোড়া যুক্ত 'ইন্টারভেনর' হিসাবে।

সুপ্রিম কোর্টের একই সামাজিক ন্যায় বেঞ্চ আগে ও পরে বিভিন্ন পর্যায়ে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছে বন্দিশালার ধারাবাহিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অর্থে 'সংশোধনাগার'-এর দিকে যাত্রার লক্ষ্যে। ২০১৮-এর ৮ মে'র এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী রায়ে জেলখানার অসুখের নির্দিষ্ট দু'টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছিল বিচারপতি লোকুর ও বিচারপতি গুপ্তের বেঞ্চ—ধারণক্ষমতার চেয়ে অত্যধিক বেশি বন্দি থাকা এবং বন্দি-সুরক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামোও না থাকা (ওয়েলফেয়ার অফিসার থেকে রক্ষী, সর্বোপরি চিকিৎসকের বিপুল শূন্যপদ)। ওই রায়ে জেলে বন্দির চাপ কমাতে এবং শূন্যপদে চিকিৎসক, রক্ষী-সহ কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যেও আরও দু'টি মামলা শুরুর জন্য সব হাইকোর্টকে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ক'দিনের মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ওই রায়ের উল্লেখ করা হয় এপিডিআর-এর তরফে। শুরু হয় আরও দু'টি মামলা। যুক্ত হয় সংগঠন। বিচারাধীন বা সাজাপ্রাপ্ত, অভিযোগের ধরন কিংবা রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক নির্বিশেষে বন্দির মানবিক অধিকার সংক্রান্ত এই বিশেষ এক গুচ্ছ মামলায় সারা দেশে কোনও আদালতে আর কোনও নাগরিক অধিকার সংগঠন সম্ভবত যুক্ত নেই।

করোনা-পরিস্থিতিতে বন্দিমুক্তি

এ বার যখন করোনা পরিস্থিতিতে ২৩ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আলাদা করে ফের জেলখানায় বন্দির চাপ কমাতে কিছু ক্ষেত্রে (সর্বোচ্চ ৭ বছর সাজার মেয়াদে এবং ইউএপিএ, অর্থনৈতিক অপরাধ, এনডিপিএস, পকসো'র মতো বিশেষ আইনে অভিযুক্ত/সাজাপ্রাপ্ত বাদে) 'সাময়িক' মুক্তির কথা বলল (অভিবাসী শ্রমিকের প্রশ্নে একের পর এক মামলা খারিজ করে সবে ২৬ মে দুর্ভোগ লাঘবে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে নোটিস দিয়েছে, আরও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে জনস্বার্থবিরোধী সরকারি অবস্থানেরই পাশে থেকেছে সুপ্রিম কোর্ট; গুটিক'য় স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগের প্রথমটিই ছিল সাময়িক বন্দিমুক্তির এই নির্দেশ, পরে মিড-ডে মিল চালু রাখার নির্দেশও গুরুত্বপূর্ণ)—তার চার দিন আগেই সমিতির সুহৃদ আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির এজলাসে করোনা পরিস্থিতিতে এ রাজ্যের জেলগুলিতে বন্দিদের সুরক্ষায় অবিলম্বে আদালতের হস্তক্ষেপ চান, জরুরি ভিত্তিতে বন্দিমুক্তির দাবি জানান। আদালত ২৪ মার্চ বন্দির চাপ কমানো সংক্রান্ত মামলাটি গুরুত্ব দিয়ে শুনবে বলে জানায়। সমিতি ও আইনজীবীর তরফে তৎক্ষণাৎ চিঠি, ই-মেল, মেসেজ মারফৎ সরকারপক্ষ-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে ২৪ তারিখ শুনানির বিষয়টি জানিয়ে প্রতিনিধিত্বের অনুরোধ করা হয়।

২৪ তারিখ যানবাহনহীন পথে কোনও রকমে রঘুনাথ চক্রবর্তী ও সমিতির এক সদস্য এবং দুই সাংবাদিক ছাড়া প্রধান বিচারপতি টিবি রাধাকৃষ্ণন ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আর কেউ হাজির হননি। বেঞ্চ বসে শুধু এই মামলাটি শোনার জন্যে। অন্তর্বর্তী জামিন বা প্যারোলে বন্দিদের সাময়িক মুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় হাই-পাওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়। হাইকোর্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকেই কমিটি গড়ার নির্দেশ দিতে চেয়েছিল। এপিডিআর-এর তরফে হাইকোর্টের মাধ্যমেই এবং মনিটরিংয়ে কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয় এবং সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত পথে স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি-র (এসএলএসএ) একজিকিউটিভ চেয়ারম্যানকে (হাইকোর্টের বরিষ্ঠ বিচারপতি) কমিটির প্রধান করার কথা বলা হয়। প্রস্তাব গ্রহণ করে হাইকোর্ট। তার আগের দিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের অন্য প্রসঙ্গগুলিও ওঠে। কমিটিকে পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত

পদক্ষেপের জন্য বলে হাইকোর্ট।

হাই-পাওয়ার্ড কমিটি ও সমিতি

বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের নেতৃত্বে হাই-পাওয়ার্ড কমিটি তিন দিনের মধ্যেই আলোচনায় বসে। ২৭ মার্চের সেই আলোচনায় কারা দপ্তরের আধিকারিক এবং সরকারি প্রতিনিধিও হাজির ছিলেন। প্রথম বৈঠকে কমিটি ২০৬০ জন বিচারাধীন বন্দিকে (প্রথম বার অভিযুক্ত, লঘু অপরাধে অভিযুক্ত মূলত) অন্তর্বর্তী জামিন ও ১০১৮ জন সাজাপ্রাপ্তকে প্যারোলে তিন মাসের জন্য (অন্য রাজ্যে ৩০-৪৫ দিনের) সাময়িক মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করে।

ওই বৈঠকের আগে ২৭ মার্চ প্রথম বার এবং পরে ২৯ মার্চ এবং ৬ এপ্রিল—মোট তিন দফায় কিছু নথি, তালিকা-সহ হাই-পাওয়ার্ড কমিটিকে চিঠি দেওয়া হয় সমিতির তরফে। তাতে বিশেষ করে বয়স্ক, অসুস্থ, মহিলা এবং প্রথম বার অভিযোগে বন্দিদের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি বা বিশেষ আইনের ধারা নির্বিশেষে সাজার মেয়াদ/সম্ভাব্য মেয়াদের শর্ত শিথিল করার আবেদন করা হয় বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায়। গোড়া থেকেই অবশ্য এই বিষয়টি বলে এসেছে সমিতি। প্রায় ৪৬০ জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তের তালিকাও দেওয়া হয় কমিটিকে প্যারোলের দাবি জানিয়ে। এঁদের বেশির ভাগই ষাটোর্ধ। সেই সঙ্গে বিচারাধীন বন্দিদের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ২০১৬-র ৫ ফেব্রুয়ারি এবং ২০১৮-র ৪ ডিসেম্বরের নির্দেশমতো অন্তত ১৪টি ক্ষেত্র বিবেচনার কথা এবং এ ব্যাপারে বিচারপতি লোকুরের বেঞ্চের নির্দেশিত পথে ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির (এনএলএসএ) তৈরি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিওর অনুসরণে জেলাজজদের নেতৃত্বাধীন জেলা-পযার্য়ের বন্দিমুক্তি রিভিউ কমিটির ধারাবাহিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয় হয়। বন্দিদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, আইসোলেশনের ব্যবস্থা, জেলা স্বাস্থ্য-অধিকর্তার মাধ্যমে নিয়মিত সব জেলে ডাক্তার পাঠানোরও দাবি জানানো হয়। হাই-পাওয়ার্ড কমিটি জেলা-পর্যায়ের কমিটির দায়িত্বের বিষয়ে সর্বাধিক জোর দেয় তাদের সুপারিশে।

দ্বিতীয় দফায় মুক্তির সুপারিশ

দ্বিতীয় দফায় ৬ এপ্রিল ফের ৭৯০ জন সাজাপ্রাপ্ত ও ৪০ জন বিচারাধীন বন্দির প্যারোল/জামিনের সুপারিশ করে কমিটি। বয়স্কদের ব্যাপারে সমিতির দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শর্তও কিছুটা শিথিল করা হয়। অন্তর্বর্তী জামিনের সুপারিশ হয় যে ৪০ জন বিচারাধীন বন্দির, তাঁদের এক-তৃতীয়াংশই মহিলা। প্রত্যেকেরই বয়স ৬০-এর বেশি। আর যাঁদের বিচার শেষ না হলেও সম্ভাব্য সাজার মেয়াদের অর্ধেক বা তার বেশি জেল খাটা হয়ে গিয়েছে—তেমন কিছু বন্দির নামও সুপারিশ করা হয়। সেই সঙ্গে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের প্যারোলেও সম্মত হয় কমিটি। তবে নথিপত্র দেখে, পুলিশকে জানিয়ে, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্যারোলে বন্দিদের ছাড়ার যে প্রক্রিয়া—তার সব মিটতে যে বিলম্ব হচ্ছে—তাও কমিটির গোচরে আনা হয়েছিল। কমিটি জট কাটানোর নির্দেশ দেয় কারা দপ্তরকে। তবে জামিনের ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে কমিটির সুপারিশ-সহ নথি পেশের পর বিচারকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষাতেও (এবং অনেক ক্ষেত্রে লক-ডাউনে নিম্ন আদালত কার্যত অচল হয়ে থাকায়) বহু সময় যাচ্ছে। আইনজীবীদের কর্মবিরতি/গরহাজিরায় সাধারণ জামিনও থমকে থাকায় সমস্যা বেড়েছে। এসএলএসএ-র অল্প সংখ্যক প্যারা লিগাল ভলান্টিয়ারই এ ক্ষেত্রে কমিটি-জেল ও নিম্ন আদালতের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করছেন বহু ক্ষেত্রে। নিম্ন আদালত কিছু ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী জামিনে অসম্মত হয়েছে—এমন উদাহরণও রয়েছে।

তবে দেশের কয়েকটি রাজ্যে জেল থেকে মুক্তির পরেও যানবাহনের অভাবে বন্দি বাড়ি ফিরতে পারছেন না বলে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট যেমন কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে বিশেষ ব্যবস্থা বা সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছিল, তার প্রয়োজন হয়নি এ রাজ্যে। কেননা, হাই-পাওয়ার্ড কমিটি গোড়াতেই ডিএম-এসপি'দের সঙ্গে আগাম কথা বলে গাড়ির ব্যবস্থা করে বন্দিদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল কারা দপ্তরকে। সেই সঙ্গে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ।

তৃতীয় দফায় মুক্তির সুপারিশ

বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে কলকাতা থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার পর স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান হন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে ২৭ এপ্রিল কমিটির বৈঠকে নতুন করে ফের আড়াই হাজার বন্দির মুক্তির সুপারিশ করা হয়। তৃতীয় দফায় ২৪০৬ জন বিচারাধীন বন্দিকে অন্তর্বর্তী জামিন ও ৪৮ জন সাজাপ্রাপ্তকে প্যারোলে ছাড়ার সুপারিশ করে কমিটি। পাশাপাশি, জেলগুলির প্রকৃত অবস্থা জানতে কলকাতার দু'টি সংশোধনাগারও পরিদর্শন করেন বিচারপতি। কারাগারের ভিতরে দূরত্ব-বিধি বজায় রাখার ব্যাপারটি নিশ্চিত করার উপরে জোর দেন তিনি। যার পূর্বশর্ত অবশ্যই বন্দি কমানো, কেননা রাজ্যে জেলের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। জেলগুলিতে চাপ কমাতে কমিটি আগের তুলনায় আরও বেশ কিছু শর্তও শিথিল করে। আগে সর্বোচ্চ ৭ বছর সাজা হতে পারে এমন মামলাতেই শুধু অভিযুক্তদের অন্তর্বর্তী জামিনের সুপারিশ করা হচ্ছিল। তা ১০ বছর সাজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। আগে শুধু একটি মামলায় অভিযুক্তেরই জামিনের সুপারিশ করা হলেও পরে দু'টি মামলায় যুক্তদের ক্ষেত্রেও সুপারিশের সিদ্ধান্ত নেয় কমিটি। এ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টে ১৫ এপ্রিল ভিডিয়ো কনফারেন্সে শুনানিতে এই সব প্রসঙ্গ-সহ বয়স্ক ও অসুস্থ সবার মুক্তির বিষয়টি ফের উত্থাপন করেছিলেন সমিতির আইনজীবী।

মোট বন্দির অন্তত ৫০ শতাংশকে মুক্তি দেওয়া জরুরি বলেও এবং নতুন করে গ্রেপ্তারিতে রাশ টানার দাবিও করা হয় সমিতির তরফে।

তবে প্রথম দফায় কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণী, মুক্তির সুপারিশ-সহ বন্দি-তালিকা হাইকোর্ট মারফৎ সমিতি পেলেও (পরবর্তীতে জন-পরিসরেও আসে কোর্ট মারফৎ) কমিটির পরবর্তী সুপারিশের লিখিত কোনও রিপোর্ট বা বন্দি-তালিকা সমিতি পায়নি। তালিকা প্রকাশ্যে না-আসায় বন্দি-পরিজনও সমস্যায়। এ নিয়ে কারা দপ্তরের এডিজি, এসএলএসএ-র সদস্যসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়। সুপারিশের বিষয়বস্তু একাধিক দফায় হাইকোর্টে ভিডিয়ো কনফারেন্স শুনানিতে জানানো হয় বটে, কারা দপ্তরের এডিজিও শুনানির সময়ে বলেন—এপিডিআর-এর চিঠি-তালিকা এবং প্রস্তাব হাই-পাওয়ার্ড কমিটিতে আলোচিত হয়েছে এবং পদক্ষেপও করা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট বা তালিকা হাইকোর্ট নিজ-রেকর্ডভুক্ত করলেও তার প্রতিলিপি কোনও পক্ষকে (হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের আইনজীবীকেও) দেওয়া হয়নি। শেষ দফা ১২ মে'র শুনানিতে যান্ত্রিক-বিভ্রাটে আরও বিপত্তি হয়। সমিতির লিখিত আবেদন কোর্টে যথা সময়ে জমা পড়লেও মৌখিক ভাবে দাবি-চাহিদার কথা শোনানো বা বেঞ্চের ডিকটেশন শোনা যায়নি। ফের চিঠি দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টে। এমনিতে পরবর্তী শুনানি রয়েছে ৯ জুন। কমিটির সুপারিশ কারা দপ্তর ও সরকারপক্ষকে অক্ষরে-অক্ষরে মানতে অবশ্য লিখিত নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

উদ্বেগ কমছে না

সাময়িক বন্দিমুক্তিতে কমিটির তিন দফা সুপারিশের পরেও অবশ্য রাজ্যের জেলে ধারণক্ষমতার চেয়ে ৬ শতাংশ বেশি বন্দি থাকার গড় হিসেবে উদ্বেগের ঊর্ধ্বমুখী 'কার্ভ' খুব একটা 'ফ্ল্যাট' হচ্ছে না। ২০২০-তে প্রকাশিত ২০১৭/২০১৮-র শেষের হিসাবে ২১৭৭২ ধারণক্ষমতায় রাজ্যে বন্দি ছিলেন ২৩০৯২ জন, ১০৬ শতাংশ; মনে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গের জেলেই গোটা দেশের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক বিদেশি বন্দি রয়েছেন—সাজাপ্রাপ্ত ১৩৭৯, বিচারাধীন ৫৭৬, অন্যান্য ৩৬১ মিলিয়ে মোট ২৩১৬ জন; দেশে সংখ্যাটা সর্বমোট ৫১৬৮। রাজ্যের জেলে রয়েছেন ১৯২টি শিশু-সহ ১৪৭ জন মহিলা। মোট মহিলা বন্দি ১৪৭৯ জন। বহু বয়স্ক বন্দিও রয়েছেন।

বিলম্বিত বিচার

রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক নির্বিশেষে বহু বন্দি বিচারাধীন হিসাবেই বছরের পর বছর আটকে রয়েছেন। অনেক সময়েই অভিযোগ প্রমাণে সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে যা, তার থেকেও বেশি দিন জেলে কাটিয়ে ফেলেন অনেকে স্রেফ বিচারাধীন বন্দি হিসাবেই! অনেকে জামিন পেয়েও বেল বন্ডের টাকা জোগাড় করতে না-পেরে জেলেই থাকতে বাধ্য হন। অনেকে প্রথম বার ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত, অপরাধের রেকর্ড নেই। এই বন্দিদের প্রতি অবিচার দূর করতে এবং জেলে ভিড় কমাতে ২০১৬-র ৫ ফেব্রুয়ারির রায়ে শীর্ষ আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৬ (এ) ধারা প্রয়োগে জামিন/মুক্তির সংস্থানে পরামর্শ দিয়েছিল। তার পরেও ২০১৮-র শেষে রাজ্যে মোট ২৩০৯২ বন্দির মধ্যে ৭১ শতাংশই অর্থাৎ ১৬৪৭৮ জন বিচারাধীন, এর মধ্যে ২৫৭৪ জন পঞ্চাশের বেশি বয়সী, ২ হাজারের বেশি বন্দি বিচারাধীন ২-৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে।

অথচ ফৌজদারি কার্যবিধির ৩০৯-এর একাধিক উপধারায় বিচার যাতে বিলম্বিত না হয়, সে কথা বলা হয়েছে। কার্যবিধির ৪৩৭-এর ৬ উপধারাও উল্লেখ্য। সর্বোপরি ১৯৭৯ সালে হুসেইনারা খাতুন মামলা থেকে ১৯৯৭-এ কমন কজ-এর মামলায় বিচারে বিলম্ব সংবিধান-স্বীকৃত জীবনের অধিকারকে (২১ অনুচ্ছেদ) লঙ্ঘন করে বলে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে বিচার শেষ করারও নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। সর্বশেষ ২০১৭-র ৯ মার্চ হুসেইন বনাম ভারত সরকার মামলায় সাত বছরের বেশি সাজাযোগ্য মামলাতেও দু'বছরের মধ্যে বিচার শেষের সময় বেঁধে দেয় সুপ্রিম কোর্ট (ক্রিমিনাল অ্যাপিল ৫০৯/২০১৭)।

বেহাল বিচারালয়ই

যদিও দেশের সব আদালত মিলিয়ে বিচারক/বিচারপতির প্রায় ৫০ শতাংশ পদই যেখানে শূন্য এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনুমোদিত পদই যেখানে অপ্রতুল, সেখানে বিচার এগোবে কী ভাবে, সে প্রশ্ন গুরুতর। বিলম্ব মানে বিচারেই বঞ্চনা। ন্যাশনাল জুডিসিয়াল ডেটা গ্রিডের সাম্প্রতিকতম তথ্য হল: জামিন হয়তো হয়েছে কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি ধরে দেশে ফৌজদারি মামলা জমে মোট ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ২২ হাজার ৬৮৩ (১-৩, ৩-৫, ৫-১০, ১০-২০, ২০-৩০ এবং ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়ে যথাক্রমে: ৬৭,১৯,৫০৮, ৩৪,৬৭,৯৪৮, ৩৬,৫৯,২৭৩, ১৮,২৬,৫১৫, ৩,১২,৫১৯ এবং ৫০,৯২৮)। পশ্চিমবঙ্গে জমে মোট ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৯৬ মামলা। এক বছরের কম সময়ে ৩,০৯,৯৭২, ১-৩ বছর ৪,৯৪,১৫০, ৩-৫ বছর ২,৯৬,০৮৫, ৫-১০ বছর ৩,৮৭,২৯৮, ১০-২০ বছর ২,৬১,২০৩। ২০-৩০ বছর ধরে ঝুলে ৩১,৪২৯, এমনকী ৩০ বছরেরও বেশি সময়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি এমন ফৌজদারি মামলা রাজ্যে ৯৫৪২টা!

বন্দি-বিক্ষোভে গুলি, হত্যা

বিচারে বিলম্ব এবং করোনা-পরিস্থিতিতে উদ্বেগ থেকেই ২১ মার্চ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। বন্দি-বিক্ষোভ যেমন সশস্ত্র এবং অগ্নি-সংযোগের পথ ধরে, তেমনই সত্তর দশকের পর ফের রাজ্যের কোনও জেলখানায় পুলিশের গুলি চলে। ৫ বন্দি নিহত হন। আহত হন আরও বেশ কয়েক জন

বন্দি এবং জেলার-সহ কয়েক জন রক্ষী। বন্দিদের রেকর্ড পুড়ে যায়, স্টোর-অফিস-রান্নাঘরও ভস্মীভূত হয় বলে খবর। পরবর্তী বেশ কয়েক দিন অসুস্থ বন্দিরা ওষুধ পাননি। খাবারও অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। নিহত বন্দিদের পরিচয়, এমনকী সংখ্যাও সরকারি ভাবে জানানো হয়নি। সবার দেহ পরিজনেরা পেয়েছেন কি না, সে নিয়েও সংশয় প্রবল। বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে বারুইপুর, প্রেসিডেন্সি, জলপাইগুড়ি সংশোধনাগারেও। হাইকোর্টে ২৩ মার্চের শুনানিতে দমদমের ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তোলা হয় সমিতির তরফে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি ওই ঘটনায় পৃথক কোনও তদন্তে সম্মত হননি। তিনি মন্তব্য করেন, ওই ঘটনা যত না উদ্বেগের জেরে তার চেয়েও বেশি পরিকল্পিত দুষ্কর্মের। তবে মৃত্যু যে অনভিপ্রেত, সেটা স্বীকার করে নেয় আদালত। বন্দিদের সঙ্গে পরিজনের সাক্ষাৎকার আচমকা বন্ধ করাও যে দমদমে ক্ষোভের অন্যতম অনুঘটক—উল্লেখ করা হয়েছিল সমিতির তরফে। এপ্রিলে ফের সাক্ষাৎকার চালু হয়।

অব্যাহত মৃত্যু-মিছিল

এরই মধ্যে গত ১৮ মে তুষার দাস (৪৮) নামে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের এক বন্দি প্রবল শ্বাসকষ্টের পরিস্থিতিতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মারা যাওয়ার পরে এবং আরও এক বন্দি জ্বর নিয়ে মেডিক্যালে ভর্তি হওয়ায় রাজ্যের জেলে বন্দি এবং রক্ষী—দু'তরফের মধ্যেই করোনা-আতঙ্ক বেড়েছে। মে মাসের গোড়াতেই মুম্বই সেন্ট্রাল জেলে (আর্থার রোড জেল) ১৫৬ জন বন্দি ও ২৮ জন রক্ষী মিলিয়ে ১৮৪ জন করোনা-আক্রান্তের খবর প্রকাশ্যে আসে। সেখানে এক বন্দির মৃত্যুর কারণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দিল্লির রোহিনী জেলেও সংক্রমণের খবর মিলেছে। আবার এক মাস আগে ১৭ এপ্রিল কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলেরই দুই আবাসিক—নদিয়ার থানারপাড়ার রাজনৈতিক কর্মী ইয়াদ আলি হালসানা (৪৯) এবং বজবজ সন্দেশপুরের আবুল কালাম মির (২৭) ক্যান্সার ও অন্য অসুখে মারা যান। দেহ পেতে চার দিন ধরে অবর্ণনীয় হয়রানির শিকার হন পরিজন। মৃত্যুর আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবরও পরিবারকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

২০১২ থেকে ২০১৮-য় ৭ বছরে দেশে জেলখানায় মোট বন্দি-মৃত্যু এবং তার মধ্যে 'অস্বাভাবিক' চিহ্নিত যথাক্রমে: ১৪৭১ (১২৬), ১৫৯৭ (১১৫), ১৭০২ (১৯৫), ১৫৮৪ (১১৫), ১৬৫৫ (২৩১), ১৬৭১ (১৩৩) এবং ১৮৪৫ (১৪৯)। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাক্রম: ৮৮ (৭), ৯০ (১০), ১০৩ (১২), ৯৮ (১২), ৮৬ (৭), ১২০ (১২), ১২০(১২)। প্রসঙ্গত, ২০১৭-র ১৫ সেপ্টেম্বরের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের গাইডলাইন অনুযায়ী বার্ধক্যজনিত এবং দুরারোগ্য অসুখে মৃত্যুই কেবল স্বাভাবিক। বাকি সব হেফাজতে মৃত্যুই 'অস্বাভাবিক'। এই গাইডলাইন এবং ২০১৬-য় কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত মডেল প্রিজন ম্যানুয়াল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নির্দেশিকা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ২০১৫-য় গৃহীত বন্দি-অধিকার সংক্রান্ত নেলসন ম্যান্ডেলা রুলসের ভিত্তিতেই 'অস্বাভাবিক' নির্ণীত হওয়ার কথা। আর তা হলে বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যাও হত আরও ভীতিপ্রদ। হেফাজতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটা বড় ধরন 'আত্মহত্যা'। আত্মহত্যা প্রতিরোধে ২০১৪ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রকাশিত পথনির্দেশ অনুসরণের কথাও মনে করিয়েছে শীর্ষ আদালত। জোর-জবরদস্তি, অবদমন-নিগ্রহ, যৌন লাঞ্ছনা, সহবন্দিদের মার, বন্দির প্রতি কারাকর্মীদের অবজ্ঞার পাশাপাশি বন্ধু-পরিজনের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, একাকিত্ব, গ্লানি, ভয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তাবোধ, আইনি সহায়তা না-মেলা, চিকিৎসার ব্যবস্থা না-থাকাকে হেফাজতে আত্মহত্যা-প্রবণতার কারণ চিহ্নিত করে কমিশনও পরিবেশ বদলাতে বলেছিল। নিয়মিত কাউন্সেলিং, আইনি সহায়তার সুযোগ তৈরি, ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা জাগানো, গঠনমূলক কাজে উৎসাহদান, পরিজনেদের সাথে ঘন-ঘন দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার যে কথা কমিশন বলেছিল, আদালতের উপলব্ধি, সে-সবে আদপেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সংশোধন, পুনর্বাসনের কথা মুখে বলা হলেও কর্তৃপক্ষই সে-সবে বিশ্বাস করে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সাধারণ লোক বিনা কারণে আইন ভাঙে না, পরিস্থিতির চাপে করে। কখনও তা লঘু ধরনের বা প্রথম বার, অবশ্যই তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে মানবিক, সংবেদনশীল হতে হবে।

২০১৫-র ১৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে বন্দি-অধিকার নিয়ে গৃহীত নেলসন ম্যান্ডেলা রুলস-এও বলা হয়েছে (৫৮-৬৩), কেউ জেলে আছে মানে বহির্জগতের থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার কারও নেই, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ থাকা চাই। বই, খবরের কাগজ, পত্রিকা পড়তে দিতে হবে। এ-সবে একাকিত্ব কমবে। আত্মপীড়নের প্রবণতা কমবে। সর্বোপরি মানুষের মর্যাদা থেকে কোনও অবস্থাতেই বঞ্চিত করা যাবে না কোনও বন্দিকে। সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতিই গণতন্ত্রের শক্তি ও ভিত্তি, জেলেও সবার সংবিধান স্বীকৃত সমস্ত অধিকার প্রাপ্য। রাজ্য সরকারগুলিকে জেলকর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও সংবেদশীল করে তুলতেও বলেছিল আদালত।

সাময়িক বন্দিমুক্তির হাল: মহারাষ্ট্র

এপ্রিলের শেষেও যে মহারাষ্ট্রে হাজার তিনেক বন্দির সাময়িক মুক্তির সুযোগ মিলেছিল, আর্থার রোড জেলের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সেখানে তড়িঘড়ি আরও প্রায় চার হাজার বন্দির মুক্তির ব্যবস্থা হয়। আরও মুক্তির প্রয়োজনীয়তা যে রয়েছে,

মুম্বই হাইকোর্টের বিচারপতি এএ সৈয়দের নেতৃত্বে সেখানকার হাই-পাওয়ার্ড কমিটির ১১ মে'র বৈঠকে নীতিগত ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ধাপে ধাপে আরও ১০ হাজার বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার কথা। মহারাষ্ট্রে করোনা-প্রকোপ সর্বাধিক। সেই সঙ্গে বন্দির ভিড়েও উপরের দিকেই রয়েছে ওই রাজ্য। সেখানে ৬৪টি জেলে ২৪ হাজার ৯৫ জন ধারণক্ষমতায় বন্দির সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার (৫০ শতাংশ বেশি) আর আর্থার রোড জেলে পরিস্থিতি আরও বহু গুণ বেশি ভয়াবহ—ধারণক্ষমতা যেখানে ৮০৪ জনের, বন্দি সেখানে ৩৭১৮! ৪৬২ শতাংশ!! পুনের ইয়েরেওয়াড়া সেন্ট্রাল জেলে ২৪৪৯ ধারণক্ষমতায় ৫৭১৭ জন, থানে সেন্ট্রাল জেলে ১১০৫-এ ৪০৩৫, কল্যাণ জেলা জেলে ৫৪০-এ ১৯৭১ এবং বাইকুল্লা জেলে ২০০ ধারণক্ষমতায় ৫১৪!

তবু এই করোনা-আবহেই ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ওই রাজ্যে নতুন করে বন্দি হয়েছেন শিক্ষক-চিন্তাবিদ, নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠন সিপিডিআর-এর সম্পাদক আনন্দ তেলতুম্বে (দিল্লিতে পিইউডিআর-এর গৌতম নভলাখা)। একই মামলায় বন্দি রয়েছেন ভারাভারা রাও, সোমা সেন, সুধা ভরদ্বাজ, রোনা উইলসনরা। এ ক্ষেত্রে একুশে আইন (ইউএপিএ) আর সুপার-এজেন্সির (এনআইএ) ওজর মারাত্মক। মুক্তি পাননি ৯০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার অধ্যাপক সাইবাবাও।

দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে আবার সিএএ-এনপিআর-এনআরসি বিরোধী গণআন্দোলনের কর্মীদের, ছাত্রছাত্রী এবং সংখ্যালঘুদের ক্রমান্বয়ে গ্রেপ্তার করা চলছে। 'পিঁজরা তোড়' আন্দোলনের মুখ দুই ছাত্রী—দেবাঙ্গনা কলিতা এবং নাতাশা নারওয়ালকে গ্রেপ্তার হাস্যকর এবং তাঁদের হেফাজতে রাখা করোনা-পরিস্থিতিতে আরওই ঝুঁকির জানিয়ে দিল্লির কোর্ট জামিনে ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার পরক্ষণেই ফের তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে অমিত শাহের পুলিশ।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মীরন হায়দর, সাফুরা জারগর, শিফা উর রহমান, আসিফ ইকবাল তনহা থেকে জেএনইউয়ের দেবাঙ্গনা, নাতাশা—লক-ডাউনের মধ্যেই দিল্লি পুলিশ পর পর গ্রেপ্তার করে চলেছে সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের মুখ এই পড়ুয়াদের। অনেককে বন্দি করা হয়েছে ইউএপিএ'তেও। অতিরিক্ত বন্দির চাপে হাঁসফাঁস তিহার জেলে রাখা হয়েছে অনেককে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্থা করা হচ্ছে জেএনইউ-এর প্রাক্তনী উমর খলিদকেও। চিকিৎসক কাফিল খানকে কুখ্যাত এনএস অ্যাক্টে বন্দি করে রেখেছে উত্তরপ্রদেশের অজয় সিং বিষ্টের (আদিত্যনাথ) সরকার। প্যারোলও পাননি কাফিল।

প্রিজন স্ট্যাটিসটিক্সের দর্পণে

প্রিজন স্ট্যাটিসটিক্সের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে (২০১৮) ধারণক্ষমতার চেয়ে ঢের বেশি বন্দির নিরিখে ভয়ঙ্কর অবস্থা আরও কয়েকটি রাজ্যের: উত্তরপ্রদেশ (৫৯ হাজারে এক লাখেরও বেশি), দিল্লি (১০ হাজারে প্রায় ১৬ হাজার, গত ২৭ মার্চে সংখ্যাটা আরও বেড়ে হয়েছিল ১৭৪৪০; ১৭৫ শতাংশ!), মধ্যপ্রদেশ (২৮ হাজারে ৪৩ হাজার), ছত্তিসগড় (১২ হাজারে ১৮ হাজারের বেশি), ঝাড়খণ্ড (১৬ হাজারে ২১ হাজার), গুজরাট (১৩ হাজারে ১৬ হাজার), হরিয়ানা (১৮ হাজারে প্রায় ২০ হাজার), উত্তরাখণ্ড (সাড়ে ৩ হাজারে ৫ হাজারের বেশি), জম্মু-কাশ্মীর (আড়াই হাজারে প্রায় ৪ হাজার), মেঘালয় (৬৫০-য় হাজারের বেশি), সিকিম (আড়াইশোয় চারশোর বেশি)। সার্বিক ভাবে সারা দেশে জেলখানায় যেখানে ধারণক্ষমতা ৪ লক্ষ, সব মিলিয়ে বন্দি প্রায় ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। এর মধ্যে বিচারাধীন, অর্থাৎ অভিযুক্তমাত্র যাঁরা, তাঁরাই সর্বাধিক, ৬৮ শতাংশ।

সুপ্রিম কোর্ট করোনা-পরিস্থিতিতে বন্দির চাপ কমানো সংক্রান্ত মামলার সূচনায় ১৬ মার্চের নির্দেশে উল্লেখ করেছিল:

'While the Government of India advices that social distancing must be maintained to prevent the spread of COVID-19 virus, **the bitter truth is that our prisons are overcrowded, making it difficult for the prisoners to maintain social distancing**. There are 1339 prisons in this country, and approximately 4,66,084 inmates inhabit such prisons. According to the National Crime Records Bureau, the occupancy rate of Indian prisons is at 117.6%, and in states such as Uttar Pradesh and Sikkim, the occupancy rate is as high as 176.5% and 157.3% respectively. **Like most other viral diseases, the susceptibility of COVID-19 is greater in over-crowded places, mass gatherings, etc. Studies indicate that contagious viruses such as COVID-19 virus proliferate in closed spaces such as prisons**. Studies also establish that prison inmates are highly prone to contagious viruses. The rate of ingress and egress in prisons is very high, especially since persons (accused, convicts, detenues etc.) are brought to the prisons on a daily basis. Apart from them, several correctional officers and other prison staff enter the prisons regularly, and so do visitors (kith and kin of prisoners) and lawyers. Therefore, there is

a high risk of transmission of COVID-19 virus to the prison inmates. For the reasons mentioned above, **our prisons can become fertile breeding grounds for incubation of COVID-19.**' (নজরটান সংযোজিত)

রেডক্রস, হু, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন-এর ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ সুপারিশের অনুসরণে আশ্রয় শিবির বা ওই জাতীয় বদ্ধ আশ্রয়ে সংক্রমণ ঠেকাতে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা এবং দূরত্ব-বিধিতেই সর্বাধিক জোর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কনফাইনমেন্ট বা ঘেরাটোপে একত্রে অনেকের সহাবস্থান-ঘনত্বের বিপদ নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত কোর্ট।

মুক্তি কোথায়?

সুপ্রিম কোর্টের ২৩ মার্চের নির্দেশের পরেও ১১ মে পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে বন্দিমুক্তির হার কিন্তু বিশেষ আশাপ্রদ নয় এই সঙ্কট-সময়েও। ১৩১টি জেলের মধ্যপ্রদেশে ৬৫০০ জন ছাড়া পাওয়ার পরেও বন্দি ৩৯০০০, অথচ ধারণক্ষমতা ২৮ হাজারের কিছু বেশি মাত্র; দিল্লিতে ১০০২৬ ধারণক্ষমতায় ১৭৪৪০ বন্দির মধ্যে মুক্তি মাত্র ৩৫৭৩ জনের; ছ'হাজার বাড়তি বন্দির ছত্তিসগড়ে ছাড়া পেয়েছেন মাত্র ৩৪১৮ জন; ১৩ হাজার ধারণক্ষমতায় ১৬ হাজার বন্দির গুজরাটে সংখ্যাটা ২৫০০; অসমে ৩১টি জেলে ৮৯৩৮ ধারণক্ষমতায় ১৮০০ জনের সাধারণ জামিন-সহ ৩৫৭৭ জনের মুক্তির পরেও বন্দি-সংখ্যা ৮৫১০ (সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ছাড়া পাওয়ার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কুখ্যাত ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্পের ৩০০ জন, রয়ে গিয়েছেন আরও ৪৭৯ জন); দক্ষিণের তামিলনাড়ুতে ১৩৮টি জেলে ধারণক্ষমতা প্রায় ২৩ হাজার। বড় রাজ্যের মধ্যে একমাত্র তামিলনাড়ুতেই বছরের পর বছর ধারণক্ষমতার ৬০ শতাংশ মাত্র ভর্তি থেকেছে। বন্দির চাপ বরাবরই কম। এ বারেও ৬ হাজার জনের মুক্তির পর বন্দির সংখ্যা সেখানে সাড়ে ১৩ হাজার, অর্থাৎ ৬০ শতাংশ (২০১৮-র শেষেও ২২৭৯২ ধারণক্ষমতায় বন্দি ছিলেন ১৩৬৭৪ জন)। সর্বমোট ধারণক্ষমতা সাপেক্ষে জেলের পর্যাপ্ত সংখ্যা, বহু রাজ্যের বিপরীতে পণজনিত নির্যাতন/হত্যা এবং নারী-পাচার উল্লেখযোগ্য কম থাকা, বিদেশি বন্দির স্বল্পতা, বিচারে দ্রুততা, প্রি-ম্যাচিওর রিলিজ-প্যারোলের হার মিলিয়ে তামিলনাড়ুর জেলে ধারণক্ষমতা ও বন্দির সংখ্যার অনুপাত সারা দেশেই আদর্শস্থানীয় বহু দিন ধরে।

অন্য দিকে বিহার আবার শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, তারা বর্তমান পরিস্থিতিতেও কোনও বন্দির মুক্তির কথা ভাবছে না! লালুপ্রসাদ যাদবও সে কারণে গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি পাচ্ছেন না। সুপ্রিম কোর্টও এ অবস্থানে আপত্তি করেনি। বন্দিমুক্তি যে বর্তমান সঙ্কটেও কোনও স্বাভাবিক অধিকার নয়—১৩ এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সেটাও জানিয়ে দেন বিহারের হলফনামা পেয়ে! উত্তরপ্রদেশে অতিরিক্ত বন্দি প্রায় ৫০ হাজার, জামিনে-প্যারোলে সেখানে মুক্তি পেয়েছেন সাকুল্যে ১১ হাজার!

অধিকার সংগঠনের ভূমিকা

আর কোনও রাজ্যে বন্দিমৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ বা বন্দির ভিড় কমানো বা ডাক্তার-রক্ষী নিয়োগের লক্ষ্যে চলা হাইকোর্টের মামলায় কোনও নাগরিক-মানবাধিকার সংগঠন যুক্ত না-থাকার ফলে এই সব বিষয়ে সরকারি বক্তব্য সাপেক্ষেই আদালত যতটুকু যা নির্দেশ দিয়েছে, দিচ্ছে। আলাদা করে করোনা-পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কয়েকজন বন্দির মুক্তির দাবিতে মুম্বই-সহ কয়েকটি আদালতে কয়েক জন মামলা করলেও নাগরিক-মানবাধিকার সংগঠনগুলির সংযুক্তির খবর বিশেষ জানা নেই। সেই সংযুক্তি থাকলে সার্বিক পরিস্থিতিগত ভাবে বন্দিস্বার্থে আরও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারত নাগরিক সমাজ। এক রাজ্যের কিছু অর্জন প্রভাবিত করতে পারত অন্য রাজ্যকে। সে পরিস্থিতি তৈরি না-হওয়াটাও উদ্বেগের।

রাজ্যে জেল-মামলার ধারাবাহিকতা

জেলখানায় উপচে পড়া ভিড় নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলায় সমিতির তরফে দু'বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবেই দাবি করে আসা হয়েছে—সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত গাইডলাইন মেনে প্রথম বার অভিযুক্ত অল্পবয়সী ও মহিলা বিচারাধীন বন্দিদের এবং যাঁরা বিচারে বিলম্বে দীর্ঘ দিন কারারুদ্ধ, বয়স্ক ও অশক্তদের মুক্তি বা অন্তত জামিন দেওয়া হোক। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে যাঁরা ১৪ বছরের বেশি জেল খেটে ফেলেছেন—তাঁদেরও মুক্তি দেওয়া হোক। গত ১৫ নভেম্বর এক শুনানিতে সমিতির আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তীর সওয়ালের পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ১৪ বছরের বেশি জেল খেটে ফেলা শতাধিক বন্দি তিন দফায় মুক্তি পেয়েছেন গত কয়েক মাসে। দেখা গিয়েছিল, স্টেট সেনটেন্স রিভিউ বোর্ডের (এসএসআরবি) সুপারিশ সত্ত্বেও রাজ্যের বিচারবিভাগীয় দপ্তরের উদাসীনতায় অনেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। প্রায় ৮ বছর পর থমকে থাকা মুক্তি-প্রক্রিয়া গতি পায় রাজ্যে। আরও কিছু এমন বন্দি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।

জেলেই জীবনভর

২০১৯-র অক্টোবরের হিসেবে রাজ্যে ১৪ বছরের বেশি জেল খেটে ফেলা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ৬৫৯। তবে আগে যেমন সরকারি স্তরে সিদ্ধান্তের পর বন্দিদের সরাসরি মুক্তি দেওয়ার সুযোগ ছিল, এখন সে পরিস্থিতি নেই। ২০১৫-র ডিসেম্বরে মুরুগন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে—যাবজ্জীবন মানে জীবনভরই সাজা। তবু রেমিশন হিসেব করে প্রি-ম্যাচিওর রিলিজ সম্ভব যদি সাজা-প্রদানকারী আদালত

(দায়রা) বা সাজা বজায় রাখা আদালত (হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট) মুক্তিতে সম্মতি দেয়। এ ক্ষেত্রে এবং অন্য বন্দিদের সাজা মকুবে অপরাধের শিকার যাঁরা, তাঁদের অধিকার, নিরাপত্তায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার নীতির কথাও অবশ্য একাধিক রায়ে বলেছে শীর্ষ আদালত (১৯৮০ সালে কৃষ্ণ আইয়ার-চন্দ্রচূড়-ভগবতী-সহ সুপ্রিম কোর্টে ৫ বিচারপতির বেঞ্চের মারু রাম রায় থেকে গত ২৩ জানুয়ারি বিচারপতি আব্দুল নাজির ও বিচারপতি দীপক গুপ্তের বেঞ্চের নিলোফার নিশা মামলার রায়)। একমাত্র রাজ্য সরকার চাইলে সংবিধানের ১৬১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মুক্তি দিতে পারে। তবে তা-ও রাজ্যপালের উদারতা-সাপেক্ষ এবং আদালতে চ্যালেঞ্জ-যোগ্য (নিলোফার নিশা মামলার রায়)। এতে ভারসাম্য থাকছে কিনা এবং জেনারেল অ্যামনেস্টির ধারণা এ ভাবে সংকুচিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা পরিবর্তনে সর্বভারতীয় পর্যায়ে নাগরিক-মানবিক অধিকার সংগঠনসমূহের বোধহয় আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জেরে বন্দিদের অধিকারও এর সঙ্গে যুক্ত। জেল যেখানে নামে অন্তত 'সংশোধনাগার', সেখানে ১৪ বছর কারাবাসের পরেও যদি কেউ সংশোধিত না হন, সেটা সরকারেরই ব্যর্থতা৷ আর সংশোধনই যদি লক্ষ্য, দীর্ঘ কারাবাসের পরে কেন স্বাভাবিক জীবনে ফেরতের সুযোগ পাবেন না বন্দিরা—এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া জরুরি। এই প্রশ্ন, যুক্তিই ১৫ নভেম্বর হাইকোর্টে শুনানিতে সমিতির তরফে তুলে ধরা হয়েছিল।

বস্তুত, যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অনেকেরই কারাবাসের মেয়াদ এমনকি কুড়ি-পঁচিশ বছরও পেরিয়েছে। দীর্ঘ বন্দিত্বে অনেকের কাছেই জীবন অর্থহীন হয়ে যায়৷ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটাও আলগা হয়ে পড়ে৷ পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়৷ সামর্থ্যের অভাবে উচ্চতরআদালতে আপিল না-করতে পেরে অনেকে ন্যায়বিচারের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন৷ দায়রায় বিচারের ভুলেও অনেককে যাবজ্জীবন সাজা খাটতে হয়। সেই অবস্থায় মৃত্যুও বিরল নয় মোটেই।

অন্য দিকে এ রাজ্যের জেল কোড এবং ১৯৯২-র সংশোধনাগার আইনে ১৪ বছর পার করে প্রি-ম্যাচিওর রিলিজের সংস্থানে স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বাধীন সেনটেন্স রিভিউ বোর্ডের (এসএসআরবি) বছরে অন্তত চার বার বৈঠক করে বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করার কথা৷ আদালতের সম্মতির বিষয়টা আসে এর পরে। এই কমিটির ভূমিকা নিয়েই বন্দি-পরিজনের অভিযোগ বহু দিনের৷ রিভিউ কমিটির বিবেচনার জন্য তদ্বিরের সামর্থ্য বা সুযোগও বহু পরিবারের নেই। পুলিশ রিপোর্টে মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতার মধ্যেও হেনস্থার বীজ লুকিয়ে। যদিও প্রি-ম্যাচিওর রিলিজে পুলিশ রিপোর্টের দরকার নেই—এ যুক্তি নব্বইয়ের দশকেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে (সিও ২১৩৬১/১৯৯৫)।

তবে হাইকোর্টে মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের বিষয়টিতে কিছুটা এগোনো গেলেও বিচারাধীনদের বিষয়ে কোর্টের একাধিক নির্দেশ সত্ত্বেও বিশেষ অগ্রগতি হয়নি এত দিন। করোনা-পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণে গত ২০ মার্চ প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণের পর গঠিত হাই-পাওয়ার্ড কমিটির হস্তক্ষেপে এই প্রথম কিছুটা কাজ হয়েছে। বিশেষত জেলা-পর্যায়ে রিভিউ কমিটিকে ধারাবাহিক ভাবে মুক্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার যে নির্দেশ দিয়েছে হাই-পাওয়ার্ড কমিটি—সেটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং দাবিটি বিশেষ ভাবেই তুলে আসছিল সমিতি। কিন্তু জেলাজজদের নেতৃত্বাধীন এই জেলা-পর্যায়ের রিভিউ কমিটিগুলির ভূমিকা এতদিন আশানুরূপ না-থাকাও বন্দির ভিড়ে জেলখানা উপচে পড়ার অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্তনে জেলাস্তরের কমিটির সক্রিয়তা বাড়াতে জেলা জেলায় সমিতির শাখাগুলির নজরদারি-ডেপুটেশনও বোধহয় জরুরি।

বন্দিমৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ মামলা

জেলে বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যু সংক্রান্ত অন্য মামলায় প্রথম দফায় ৩০টি পরিবার ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। সরকারি তালিকার বাইরে সমিতি প্রায় একশো অতিরিক্ত নামের তালিকা দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য হল, এই প্রথম ভারতে কোনও রাজ্যে জেলে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্থায়ী একটি স্কিম তৈরি হয়েছে।

২০১৮-র ১১ অক্টোবরে সমিতির সওয়ালের জেরেই ক্ষতিপূরণের সর্বনিম্ন অঙ্ক ৩ লক্ষ টাকা করে হাইকোর্ট। এবং সেটিকে অন্তর্বর্তী বলে উল্লেখ করে স্থায়ী স্কিম তৈরির নির্দেশ দেয়। ২০১৯-এর নভেম্বরে গেজেট নোটিফিকেশনে প্রজ্ঞাপিত স্কিমে ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে জেলে চিকিৎসায় অবহেলায় মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের কথাও বলা হয়েছে স্কিমে। কেন অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ, বিস্তারিত উল্লেখে কারা দপ্তর, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি (ডিএলএসএ) ও জেলাশাসকের দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করা প্রয়োজন প্রতিটি এমন ঘটনায়। এর পাশাপাশি, স্কিম-এর সীমাবদ্ধতা, ঘাটতি-খামতি সংশোধন/পরিমার্জনেও কোর্টে সচেষ্ট রয়েছে সমিতি।

সেই সঙ্গে ২০০৮-এর ১৬ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি জেলে ভয়াবহ সংঘর্ষে দুই বিচারাধীন বন্দি মহম্মদ আজহারউদ্দিন ও মহম্মদ জাহাঙ্গিরের নিহত হওয়ার ঘটনায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে হাইকোর্টে পরিবারের তরফে পৃথক মামলাতেও এপিডিআর সঙ্গে রয়েছে। নতুন তৈরি স্কিমে ক্ষতিপূরণ প্রদানে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ওই হত্যায় কারাকর্মীদের নাম জড়িয়েছিল৷ এপিডিআর-এর মামলায় কারাকর্তাকে হাইকোর্টে তলব করে ওই কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় অনুমতি দানে বাধ্য

করেছিল একদা প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। নগর দায়রা আদালতে এখনও সেই ফৌজদারি মামলায় বিচার চলছে।

জেলে ডাক্তার, রক্ষী নিয়োগ

রাজ্যের জেলখানায় ডাক্তার-রক্ষী মিলিয়ে ৯৯২টি শূন্যপদ পূরণে হাইকোর্ট ২০১৮-র ৯ জুলাই ৬ মাসের সীমা বেঁধে দিয়েছিল (এর মধ্যে রেগুলার, চুক্তিভিত্তিক, আংশিক মিলিয়ে চিকিৎসকের শূন্যপদ ৭৩। তিন ধরনের ফার্মাসিস্ট এবং রক্ষীর শূন্যপদ যথাক্রমে ৪২ ও ৭৪৫। রাজ্যের জেলে আবার ল্যাব টেকনিসিয়ানের কোনও পদই নেই! ২০১৮-য় ৯৯২ শূনপদ বেড়ে প্রায় ১৪০০ হয়েছে ইতিমধ্যে)। নিয়োগ সময়ে না-হওয়া নিয়ে সমিতি কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পরেই পিএসসি-কে মামলায় পক্ষ করা হয়। পরবর্তীতে পিএসসি এবং কারা দপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বেশ কিছু দূর এগোয়। এপ্রিলে বড় সংখ্যক শূন্যপদে নিয়োগের কথা ছিল। লক-ডাউনে সেটা ফের অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তবে আদালত এ সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে রেখেছে। আশা করা যায়, জুন মাসে শুনানিতে বিষয়টি আসবে। তবে ২০১৮-র শেষে সারা দেশে অনুমোদিত ৮৫ হাজার ৮৪০টি অনুমোদিত পদের ২৫,৮১৬টিই শূন্য! কারাকর্মী-পিছু বন্দি-সংখ্যার অনুপাত গোটা দেশ এবং এই রাজ্যে অবশ্য একই, ৭।

অসুখ বহু গভীরে

২১ মার্চ দমদম সংশোধনাগারে যা ঘটেছে বা আগে-পরে প্রেসিডেন্সি-বারুইপুর বা জলপাইগুড়িতে, তাতে আপাত যে-কারণই সামনে আসুক—মূল সমস্যাটা কিন্তু অনেক গভীরে। দীর্ঘ দিন ধরেই সেই সব সমস্যার সুরাহার বিষয়টি রয়ে গিয়েছে উপেক্ষিত। খাবারের নিম্নমান থেকে শুরু করে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা না-হওয়া, পরিজনের সাক্ষাতে উৎকোচ দিতে বাধ্য করা, একাংশ সাজাপ্রাপ্তকে দিয়ে নিগ্রহ-নির্যাতন, কারাকর্মীদের ঘৃণ্য ব্যবহার—দীর্ঘ দিনের এই সব সমস্যা থেকে মুক্তিতে আদালতের বার বার নির্দেশেও তেমন কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয়নি।

ধারণক্ষমতার চেয়ে কোথাও কোথাও দ্বিগুণ বেশি বন্দির ভিড়েও অনেক দিন ধরে চরম দুরবস্থা চলছে রাজ্যের ৬০টি সংশোধনাগারের কয়েকটিতে। জেলাজজদের গত অগস্টের রিপোর্টে প্রকাশ, দমদম সংশোধনাগারের ধারণক্ষমতা যেখানে ২৬৫৯, বন্দি ছিলেন প্রায় ৩৩০০। ২৭২ ধারণক্ষমতার মালদা জেলে বন্দি হাজারেরও বেশি। তার মধ্যে ৯১৩ জনই বিচারাধীন। হাওড়ায় ধারণক্ষমতা ৪৮৮, বন্দি সেখানে ৭১১। বারাকপুরে ১৯৭ ধারণক্ষমতায় বন্দি ৩৩১। বসিরহাটে ১০৮ জনের জায়গায় ৩৭৩। জঙ্গিপুরে ১০৫-এর জায়গায় ২৬৫। রানাঘাটে ১২৬ জনের জায়গায় বন্দি ২৫৬। উলুবেড়িয়ায় ৮০-র জায়গায় ১৫৮, শ্রীরামপুরে ৯৪-এর জায়গায় ২২৬! আবার পুরুলিয়ার মতো জেলা জেলে ৭৬ শতাংশই খালি (৮৪৮-এ ২০৭)। কিছুটা বন্দি কম মেদিনীপুর, বালুরঘাট, কাঁথি জেলেও।

এ দিকে নতুন সংশোধনাগার হয়নি (বিশেষত মুক্তকারা রাজ্যে মোটে ৫টি, রাজস্থানেও যেখানে সংখ্যাটা তিরিশের বেশি), উল্টে এক বছরেরও বেশি বন্ধ আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার। সেগরিগেশনের (পৃথক রাখার) সুবিধা থেকে হাসপাতাল—আলিপুরে সে-সব ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আবাসন প্রকল্প, উপনগরীর সন্দেহজনক পরিকল্পনায় হেরিটেজ জেলে তালাই পড়ে গিয়েছে। এক দিকে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি বন্দি, আর বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো রক্ষী-চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ার বদলে ক্রমান্বয়েই কমেছে। ৬০টি সংশোধনাগারের জন্য রেগুলার মেডিক্যাল অফিসারের অনুমোদিত পদই মাত্র ২৯টি। এবং যতই বিস্ময়কর হোক, গত কয়েক বছর ধরে এই ২৯টির মধ্যে ২৫টিই রয়ে গিয়েছে শূন্য! সব মিলিয়ে ডাক্তারের শূনপদ ৭৩। করোনাভাইরাস নিয়ে দেশব্যাপী ত্রাসের এই সময়ে বন্দিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামোই নেই। আবার এমনিতেও ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি বন্দি যেখানে, সেখানে আইসোলেশন ওয়ার্ড চালুও অসম্ভব। বহু জায়গায় রক্ষীর অপ্রতুলতায় ওয়ার্ড/ মহিলা ওয়ার্ড বন্ধ রাখতে হয়েছে। আবার প্রেসিডেন্সি-সহ একাধিক সংশোধনাগারে দীর্ঘ দিন মেরামতির কাজ না-হওয়ায় ভগ্নপ্রায় হয়েছে অনেক ওয়ার্ড। সেগুলিও বন্ধ। ফলে কিছু জেলে ভিড় মারাত্মক। দমদম, মালদা, জঙ্গিপুরের মতো কয়েকটি জেলে বিদেশি বন্দিও অত্যধিক।

জেলগুলির দুর্বিষহ হালের সার্বিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বন্দিদের নিয়মিত কাউন্সেলিং, আইনি সহায়তার সুযোগ তৈরি, ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা জাগানো, গঠনমূলক কাজে উৎসাহদান, পরিজনের সাথে ঘন-ঘন দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার কথা বলেছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও। কিন্তু খোদ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সে-সবে আদপেই গুরুত্ব দেয় না কোনও সরকার। বন্দিরা যাতে আরও ঘন-ঘন পরিজনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সাক্ষাতের সময় বাড়ে, ভিডিয়ো কনফারেন্স এবং ফোনে যোগাযোগের সুযোগ পান—তারও ব্যবস্থা করতে বলেছে কোর্ট। করোনা পরিস্থিতিতে বন্দি-সাক্ষাৎ কিছু দিন বন্ধ রাখার সময়েও কিন্তু রাজ্য কারা দপ্তর ভিডিয়ো সাক্ষাৎ চালু করেনি।

অনেক সময়েই অভিযোগ প্রমাণে সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে যা, তার থেকেও বেশি দিন জেলে কাটিয়ে ফেলেন অনেকে স্রেফ বিচারাধীন বন্দি হিসাবেই! এই রকম বন্দিদের প্রতি অবিচার দূর করতে এবং জেলে ভিড় কমাতে ২০১৬-র ৫ ফেব্রুয়ারির রায়ে শীর্ষ আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৬ (এ) ধারা প্রয়োগে জামিন/মুক্তির সংস্থানে পরামর্শ দিয়েছিল। প্রতি জেলায় বিচারাধীন বন্দিদের এই অধিকার পর্যালোচনার জন্যেই জেলা জজ, জেলাশাসক, পুলিশ আধিকারিক এবং

ডিসট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব-কে নিয়ে রিভিউ কমিটি গড়ে নিয়মিত বৈঠকের নির্দেশ রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের৷ সরকারের বাইরের বিশিষ্ট মানুষজনকে নিয়ে ভিজিটর্স বোর্ড তৈরি করে জেলের হাল ফেরাতে নিয়মিত পরিদর্শন, অসরকারি সংগঠনগুলিকে সামিল করে ধারাবাহিক কার্যক্রমের কথাও বলা হয়েছে৷ কিন্তু কাজ বিশেষ হয়নি। সাময়িক বন্দিমুক্তিতেও সমস্যামুক্তি হবে না। নতুন জেল, মুক্তকারার সংখ্যাবৃদ্ধি জরুরি। সবচেয়ে জরুরি জেল ও বন্দি নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সরকারের, বৃহত্তর নাগরিক সমাজেরও।

বিষম-সমাজের ছবি

অপরাধের শিকড় আসলে সমাজ-অর্থনীতির গভীরে, অধিকাংশ 'অপরাধ'ই ঘটে সামাজিক অসমতা, অবিচার-অন্যায়ের পরিণতিতে। ২০১৮-র শেষে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি সারা দেশে ১,৩৯,৪৮৮ জন, রাজ্যে ৬২৫৩৷ দেশের সার্বিক হিসাবে এই সাজাপ্রাপ্তদের ৩৮,০৩১ জন নিরক্ষর, দশম মানের নীচে ৫৮,৫৪১, স্নাতকের নীচে ৩০৭৯০, স্নাতক ৮,৪৬৬, স্নাতকোত্তর ২,২৯৬, প্রযুক্তি ডিগ্রি ১,৩৬৪ জনের৷ রাজ্যে এই সংখ্যাক্রম: ৩৪৪৯, ১৮৭৪, ৭৫৮, ১৪১, ২১ ও ১০। সারা দেশে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে তফসিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত/ওবিসি এবং মুসলিম যথাক্রমে ২৯,৩৭০, ১৮,৮১৪, ৪৮,৬৪৩ ও ২৪,০৪৭। রাজ্যে ১,৩১১, ৩০৫ এবং ৫৮৫ এবং ২,৩৫৯। দলিত, সংখ্যালঘু আর শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মানুষের দুর্গতিই বেশি৷ বিচারের সুযোগলাভে বৈষম্যের ছবিটা খুব স্পষ্ট।

কোনও মানুষ অপরাধী হয়ে জন্মায় না। মনুষ্যত্বের শাশ্বত দাবি, কোনও মানুষকে মনুষ্যেতর না-ভাবা। বন্দিকে মানুষের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া, তাঁর সংশোধনে আস্থা রাখা প্রয়োজন। আধুনিক বিচারব্যবস্থার লক্ষ্যই সংশোধন। 'হেট দ্য সিন নট দ্য সিনার'-এর প্রতিধ্বনি করে ১৯৫৪-য় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন তাঁর 'এনসিয়েন্ট এসিয়ান ভিউ অব ম্যান' শীর্ষক ভাষণে বলেছিলেন, 'এমন এক জনও থাকতে পারে না যার সংশোধন অসম্ভব।' শুধু বিবেকের বন্দি বা মতাদর্শের কারণে বন্দিরাই নন, আটকখানায় অন্তরীণ প্রত্যেকের মানবিক অধিকার আদায়ে নাগরিক উদ্যোগ, সক্রিয়তা এই কঠিন সময়ে আরও বেশি করেই জরুরি।

All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person — Article 10 ICCPR

তথ্যানুসন্ধান (APDR, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি)

সরকার কোথায়!

ছবি ১: মৈপীঠ থানা এলাকার মধ্য পূর্ব গুড়গুড়িয়া। প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ফুট ঠাকুরানী নদী বাঁধ ভেঙে যায়! স্থানীয় প্রশাসন, ইরিগেশন, পঞ্চায়েত কারোরই দেখা মেলেনি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ইতিমধ্যে প্রায় ২০০০ বিঘে জমি জলের তলায়, নোনা জলের তলায়। সেই জমিতে চাষ ছিল লঙ্কা, উচ্ছে এবং কিছু ছোট মাছের ভেড়ি, যাতে মাছের চাষ হতো, মিঠে জলে। নোনা জল ঢুকে সমস্ত মাছ মরে ভেসে উঠেছে।

তাই, গ্রামবাসীরা নিজেরাই হাত লাগিয়েছে। না হলে তাদের আর যেটুকু আছে সবই চলে যাবে ঠাকুরানী নদীর কবলে! তবুও, প্রশাসনের দেখা নেই, সরকারের দেখা নেই!

ছবি ২: কুলতলির দেউলবাড়ি এলাকার নদী বাঁধ ভেঙে যায় আম্ফানের দাপটে! ঝড়ের শুরুতে কিছুটা আন্দাজ করে স্থানীয় পঞ্চায়েত কিছু বালি ভর্তি বস্তা ফেলে দেয়। তাও নদী বাঁধ কে রক্ষা করতে পারেনি!

আম্ফানের দাপট শুরু হওয়ার আগে রাজ্য প্রশাসন থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন নিরাপদ জায়গায় মানুষকে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে গেছেন। ঝড় শুরু হতেই গ্রামের মানুষরা স্থানীয় ফ্লাড সেন্টারে চলে যান। কেউ কেউ স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে চলে যান। কিন্তু সেখানে না আছে পানীয় জল, না আছে খাবারের বন্দোবস্ত!

কয়েক হাজার মানুষ বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন তাদের খাবার বা যথোপযুক্ত থাকার ব্যবস্থা করেনি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, কুলতলী বিডিও-কে বেশ কয়েকবার ফোন করেও তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি! সরকার কোথায়? সুন্দরবনের এই অঞ্চলের প্রায় ফি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে! বছরের পর বছর চলে যায় কোনো পরিকল্পনা নেই! নদী বাঁধগুলোকে ভালোভাবে মেরামত করার প্রয়োজন বোধ করে না!

কত মানুষ ঘরছাড়া! তাদের শেষ সম্বলটুকুও চলে যাবে! তবুও সরকারের, প্রশাসনের ঘুম ভাঙে না! ভোট যায়, ভোট আসে। প্রতিশ্রুতি আসে আর উড়ে যায়! সাধারণ মানুষ যে দুর্ভোগে ছিলেন, সেই দুর্ভোগই থাকেন! এই সমস্ত দুর্যোগ তাঁদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে যায় শুধু!

প্রশাসন কোথায়? সরকার কোথায়?

লক-ডাউন পরিস্থিতিতে এ পি ডি আর -এর রাজ্য জুড়ে সংগঠিত কর্মসূচি

উত্তর চব্বিশ পরগনার শাখাগুলি লক-ডাউন পরিস্থিতিতে যে কাজগুলি করতে পেরেছে:

বনগাঁ শাখা:

কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের সাথে মহকুমা শাসকের কাছে একটি আবেদনপত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য ও সামাজিক সুস্থিতি রক্ষার আবেদন জানানো হয়েছে।

বারাসাত শাখা:

ভারাভারা রাও সহ সমস্ত রাজবন্দির মুক্তি, শ্রম আইন শিথিল করে করোনার ছুতোয় শ্রমিকদের ১২ ঘন্টা কাজ করানোর প্রতিবাদে, করোনা পরিস্থিতিতে সকলের জন্য রেশন ও করোনায় মৃত পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে এ পি ডি আর, বারাসাত শাখা ও এ আই পি এফ যৌথ প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করে ১৬ই মে শনিবার বারাসাত স্টেশন চত্বরে। পোস্টার, স্লোগান, বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একদিকে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বেসরকারি পুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দেয়া, অন্যদিকে প্রতিবাদীদের বেআইনিভাবে আটক করা, শ্রম আইন শিথিল করা, ঘরে ফিরতে চাওয়া শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যুতে সরকারের উদাসীনতার কথা তুলে ধরা হয়। অঞ্চলের রেশনিং, ইটভাটা শ্রমিকদের জন্য রেশন ব্যবস্থা নিয়ে জেলা শাসককে চিঠি ও প্রশাসন দপ্তরে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। অন্যান্য সংগঠনের সাথে ত্রাণে শাখা এবং শাখার সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে মানুষের পাশে থাকছে। বন্দীমুক্তি, শ্রম আইন এবং করোনা পরিস্থিতিকে সামনে রেখে যৌথ উদ্যোগে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বীজপুর শাখা:

লক-ডাউন পরিস্থিতিতে শাখার পক্ষ থেকে তিনশো পরিবারের সাথে সহযোগিতা করা হয়েছে।

পানিহাটি শাখা:

লক-ডাউনের সময় এ পি ডি আর, পানিহাটি শাখা, বিজ্ঞান চেতনা ও আহ্বান সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে ৫০০ পরিবারের মধ্যে কমিউনিটি কিচেন পরিচালনা করে ও অসহায় পরিবারগুলিকে খাবারদাবার সরবরাহ করা হয়। ১৮ মে থেকে আরও ৫০টি পরিবারের মধ্যে যৌথভাবে কমিউনিটি কিচেন পরিচালনা করার ভাবনা আছে।

বেলঘরিয়া-নিমতা শাখা:

সদস্যরা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় গণ-সংগঠনগুলির উদ্যোগে অংশ নিয়ে ভিনরাজ্য থেকে আসা, এবং এলাকার অসংগঠিত শ্রমিকদের পাশে থেকেছে।অঞ্চলেই একটি রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়েছে। বেলঘড়িয়ার বাসুদেবপুরে নিজের উদ্যোগে ত্রাণ দেওয়ায় এক যুবক স্থানীয় কাউন্সিলর ও তার সহযোগীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। শাখার পক্ষ থেকে সেখানে তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছ।

রাজারহাট শাখা:

ভিআইপি রোডের পাশে, চার্ণক হসপিটালে একজন ডাক্তারবাবুর কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে, হাসপাতালটি বন্ধ হয়। এতে সেখানকার একজন মহিলা কর্মী নিজের আবাসনে ঢুকতে বাধা পান। শাখার আবেদনে বাগুইআটি থানা তাকে সাহায্য করে। এছাড়া, শাখা নিজেদের অঞ্চলে ত্রাণ বণ্টন করে।

বসিরহাট-সংগ্রামপুর শাখা প্রস্তুতি কমিটি:

বারাসাত শাখার সহযোগিতা, সংগ্রামপুর নাগরিক সুরক্ষা কমিটি ও বসিরহাট-সংগ্রামপুর শাখা প্রস্তুতি কমিটির প্রচেষ্টায় ইটভাটা শ্রমিকদের ৮৫ টি পরিবারের মহিলাদের হাতে কিছু করে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া সম্ভব হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শাখাগুলি লক-ডাউন কালিন যে কাজ করতে পেরেছে:

কোনো রকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই সরকার করোনা ভাইরাস জনিত অতিমারী-র মোকাবিলা করার জন্য প্রথমে জনতা কার্ফু (২২/০৩/২০২০) এবং সেই রাত থেকেই লক-ডাউন ঘোষণা করে। মুখ থুবড়ে পড়া বেহাল সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে মানুষের চিন্তা চেতনাকে প্রায় অসাড়ত্বে পর্যবসিত করে, কিছু কর্মসূচী পালনের বিধান দিয়ে, সমস্ত বিষয়টিকে একটা জাতীয়তাবাদী বাচনে মুড়ে ফেলে লক-ডাউন মেনে চলতে বাধ্য করা হয়।

হতচকিত জনসাধারণ রোগ না খিদের জ্বালা কোন টা বেশি ভয়ঙ্কর তার নিরসন নিজেরাই করে ফেলে। সরকারী ঘোষণা এবং গুজবে (তিন দিনের মধ্যে টাকা না তুললে জনধন যোজনার টাকা ফেরত যাবে। উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস তাড়া তাড়ি না তুললে পাওয়া যাবে না) প্রভাবিত হয়ে দৈহিক দূরত্ব বজায় না রেখে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, রেশন দোকান, গ্যাসের অফিসের সামনে ভীড় করে। এইভাবেই চলে লক-ডাউন!

ডায়মন্ড হারবার শাখা

১) লক-ডাউন দীর্ঘায়িত হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার এলাকার দর্জি শ্রমিকদের রুজি রোজগার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তাদের সেলাই করা পোশাক ওস্তাগার এর কাছে পৌঁছে দিতে পারেনা আবার নতুন কাজ ও আনতে পারে না। এরকম অবস্থায় শাখার প্রচেষ্টায় ও কিছু সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় দর্জি শ্রমিকদের আর্থিক সুরাহা করা হয়।

২) দীর্ঘ লক-ডাউনের ফলে যে সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভুত হয় তার প্রতিবাদে আমরা একটা লিফলেট প্রকাশ করা হয়। ২১/০৪/২০২০ থেকে লাগাতার পোস্টারিং করা হয় ও লিফলেট বিতরন করা হয় ডায়মন্ড হারবার- এর বিস্তীর্ণ এলাকায় (যেমন- ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা, সরিষা হাট, পাতড়া নতুনহাট, বাসুলডাঙ্গা, পঞ্চগ্রাম সহ অন্যান্য জায়গায়)। এখনও পোস্টারিং চলছে।

৩) সরিষা স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজারের মদতে একটা সক্রিয় দালাল চক্র চলছে। ভারতীয় জীবন বীমা এজেন্ট ব্যাংকের ভিতরে বসেই গ্রাহকদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলার ও অন্যান্য কাজে ফর্ম ফিলাপ করার সময় তাদের অজ্ঞাতসারে এলআইসি করিয়ে নিচ্ছেন। এসবিআই লাইফ পলিসিকে বঞ্চিত করে, ব্যাংকের কোড অফ কন্ডাক্ট কে অগ্রাহ্য করে।

এছাড়াও ম্যানেজারের বদান্যতায় কিয়স্ক গুলি পরিচালনার ভার পেয়েছে একই পরিবারের লোক। কামারপোল অঞ্চলের কালীচরনপুর এলাকার কিয়স্কটি সেই এলাকায় কাজ না করে মূল শাখার সামনে P.W.D. জায়গার ওপরে গেড়ে বসেছে। কালিচরণ পুর এলাকার লোকেরা ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ৭ কি.মি দূর থেকে তাদের ছুটে আসতে হচ্ছে সরিষায়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে রিজিওনাল অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে, এলাকায় পোষ্টার ও মারা হয়েছে। কিন্তু কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় রিজিওনাল অফিসে আবার মেইল মারফত অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে, গত ২৮ এপ্রিল।

৪) এ ছাড়াও সাংগঠনিক ভাবে একটা ত্রান তহবিল গঠন করা হয়েছে, আর্থিক সঙ্কটে থাকা মানুষদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণের জন্য।

৫) ভিন রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার নানান পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং প্রচেষ্টা চলছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার দাবিতে বারুইপুর মহকুমা শাসক, ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

৬) দীর্ঘ লক-ডাউনে শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ঘাটতি মেটাতে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর অনলাইন শিক্ষার নিদান দেয়। স্কুলগুলি এই নির্দেশ পালন করতে চাইলেও সম্পূর্ণ সফলতা পায় না। কারণ সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে (কিছু নামকরা স্কুল বাদ দিলে) বেশির ভাগ শিক্ষার্থী নিম্নবিত্ত পরিবারের ও প্রথম প্রজন্মের। তাদের বাড়িতে স্মার্টফোন নেই, নেই কম্পিউটারও। তাছাড়া প্রত্যন্ত এলাকা গুলিতে নেটওয়ার্ক কানেকশনও বেশ দূর্বল। ফলে এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা অনলাইন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে সাম্য থাকে। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় তা থাকছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে এই বৈষম্য না বাড়ে সেজন্য অনলাইন শিক্ষা স্থগিত রাখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রী ও ডি আই অব স্কুল কে একটি চিঠি করা হয়।

৭) লক-ডাউন এর ফলে বহু গুরুতর রোগী যেমন ক্যান্সার আক্রান্ত, হার্ট, কিডনির সমস্যায় ভুগছেন (যাদের ডায়ালিসিস করা হয়) এমন রোগীরা ঠিকঠাক চিকিৎসা পাচ্ছেন না। এরকম একটি কেস ঘটে রামনগর থানার নেওদা গ্রামে। দীপক মন্ডল নামে ক্যান্সার আক্রান্ত এক ব্যক্তি লক-ডাউন এর জেরে কাজ হারিয়ে ওষুধ কিনতে না পেরে মারা যান। এই ঘটনা সামনে আসার পর ডায়মন্ড হারবার শাখার পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয় স্বাস্থ্যকর্মীদের মারফত এলাকাভিত্তিক এরকম রোগীদের তালিকা তৈরি করতে এবং এবং তাদের সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌছে দেবার।

৮) মারণ কোন ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসন থেকে মাইক প্রচার করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। শাখার পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয় -র নির্দেশিকায় বলা ছিল সংক্রমণ ঠেকাতে দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন, সামাজিক দূরত্ব নয়। সামাজিক দূরত্ব এই শব্দবন্ধটি মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা হচ্ছে। মানুষকে জনবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে। তাই এই প্রচারে সামাজিক দূরত্ব শব্দটি বাদ দিয়ে দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখা হোক এই কথাটি যেন প্রচার করা হয় এই আবেদন জানিয়ে বিডিও কে চিঠি করা হয়।

৯) ২৭/০২/২০২০ তারিখে ফলতা থানার কোদালিয়া গ্রামে (আইনের চোখে অভিযুক্ত) কিছু ব্যক্তি ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার পাতড়া গ্রামের সাবির মোল্লা কে ওই ব্যক্তিদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ফলতা থানায় ধরে নিয়ে যায় ও কোন মামলা ছাড়াই তাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আটকে রাখে। শাখার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হলে তারপর রাত বারোটার সময় তাকে ছেড়ে দেয়।

১০) ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা

কমিটির সহায়তায় সিএএ, এনআরসি এনপিআর বাতিলের দাবিতে ২৮/০২/২০২০ ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসকের কাছে মিছিল সহযোগে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে প্রায় শতাধিক মানুষ।

১১) ডায়মন্ড হারবার শাখা ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রায় প্রতিবছর কোনো না কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ বছর ভাষার জন্য, দেশের জন্, মাটির জন্য এই শিরোনামে একটি লিফলেট প্রকাশ করে এবং ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে গান, কবিতা ও বক্তৃতা সহযোগে।

মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখা -

১) শাখার তরফে করোনা আবহে প্রথম থেকেই বহু কাজ করা হয়েছে। লক-ডাউন শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পর থেকেই নিয়মিত মহেশতলা ও মেটিয়াবুরুজ এলাকায় ত্রাণ দেওয়া হয়েছে; আজ অবধি কাজ চলছে। মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে এবং সামাজিক দূরত্ব ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো নিয়ে পোস্টারিং করা হয়েছে। সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং-এ জুমের সাহায্যে যোগ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের বেশ কিছু মানুষ বাইরে বিশেষত সেকন্দ্রাবাদ-এ আটকে পড়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে, এখানে যারা কাজ করছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আমাদের শাখার বহু সদস্য অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিলেন। তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদের সাহায্য করা হয়েছে। লক-ডাউনের জন্যে যাতায়াতের অসুবিধা সত্ত্বেও বিভিন্ন সদস্যদের যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনও আমরা ত্রাণের কাজ করে চলেছি। উল্লেখ্য, এ পি ডি আর কেন্দ্রীয় কমিটির বহু সদস্য নিরবে আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন ও সবসময় খোঁজ খবর করছেন।

২) মহেশতলার বিভিন্ন পাড়ায় যেমন নোয়াপাড়া, ময়নাগড় বাটানগর, জালখুরা, সন্তোষপুর, মেটিয়াবুরুজের বটতলা এলাকা ও আকড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কিছু কাশ্মীরি শালওয়ালা সহ বহু মানুষ ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।

সোনারপুর শাখা -

১) লক-ডাউনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা গুলি নিয়ে পোস্টারিং করা হয় ও লিফলেট বিতরন করা হয়।

ক্যানিং প্রস্তুতি কমিটি -

১) ক্যানিং মহকুমার জীবনতলা এলাকায় একটি অসুস্থ পরিবার লক-ডাউনে অসুবিধার মধ্যে পড়েন। বাবা ক্যান্সার রোগী, মা হার্টের রোগী এবং মেয়েও রোগী। প্রতি মাসে প্রায় ১২ হাজার টাকার ওষুধ খরচ, তার ওপর সংসার চালানো। এপিডিআর, দ:২৪প: জেলা কমিটির কাছে এক বন্ধু মারফত খবর আসে। আমরা মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং গড়িয়া শাখার সহযোগিতায় তাদের আর্থিক সাহায্য করা হয়।

২) দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন রাজ্যে মানুষ যাতায়াত করেন। কাকদ্বীপ অঞ্চলের প্রায় ৩৫ জন মানুষ অন্ধ্রপ্রদেশে আটকে পড়েন। শাখার পক্ষ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জয়নগর শাখা -

১) লক-ডাউনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন এলাকার বনজীবী মানুষেরা (মৎস্যজীবী, মধু আহরণকারী, কাঁকড়া ধরতে যাওয়া)। বহু আগে থেকেই বনদপ্তর এদের কাজে বাধা দেয়। কাঁকড়া ধরতে, নদীতে জাল নামাতে, মধু আনতে সম্পূর্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আর তারপরেই ঘোষিত হয় লক-ডাউন। এই বিপর্যয়ে বহু পরিবার অর্ধাহারে-অনাহারে রয়েছেন।

জয়নগর শাখার উদ্যোগে এবং দঃ ২৪ পঃ জেলা কমিটির সহযোগিতায় গত ৮মে সুন্দরবনের মৈপীঠ ও কুলতলি থানার কাঁটামারি, পূর্ব গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলে বাঘে আক্রান্তের পরিবার এবং বনজীবী মানুষদের অল্প কিছু ত্রাণ নিয়ে এলাকার মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের জীবন সংগ্রামে পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়।

২) ভিন রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে বি ডি ও-র কাছে স্মারক লিপি দেওয়া হয়।

গড়িয়া শাখা -

১৯/০৩/২০২০ গড়িয়া প্রস্তুতি কমিটি থেকে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শাখার রূপ পায়।

১) গড়িয়া শাখার সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৯/০৩/২০২০ মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে বাস গড়িয়া অঞ্চলে একটি মিছিল করা হয়।

কলকাতা জেলা:

বেহালা শাখা

করোনা ভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমাদের শাখা সাধ্যমতো কাজ করার চেষ্টা করে চলেছে। বেহালায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ফলে পুলিশি নজরদারি খুবই বেশি। তবুও কিছু কাজের চেষ্টা করা হয়েছে।

কয়েকটি সংগঠনের সাথে যৌথভাবে ময়নাগড়-খানবেড়িয়া অঞ্চলে (দুইবার), বড়িশা বৈশালী পার্ক অঞ্চলে কিছু বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে। বেহালার কয়েকজন সদস্যের উদ্যোগে খেয়াদহ-১ অঞ্চলে ১৯০ টি জনজাতি পরিবারকে সাহায্য করা হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সদস্যরা নানাভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন। মাস্ক ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ ও আর্থিক সাহায্য ছাড়াও বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষের

বাড়িতে ওষুধসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করেছেন।

বেহালার পাঠকপাড়া অঞ্চলে ২২ জন শ্রমিক (যারা মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা) বাড়ি ফেরার জন্য সহযোগিতা চেয়ে শাখায় যোগাযোগ করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন (আতাহার হুসেন) বেহালা শাখারই সদস্য। ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের সাথে কথা বলে এবং বেহালা থানায় যোগাযোগ করে এদের বাড়ি ফেরানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশাসনের ওপর চাপ আসায় এই ২২ জন শ্রমিকসহ বেহালার প্রায় ২০০ জন শ্রমিককে দু'টো বাসে করে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে পৌঁছোলে মুর্শিদাবাদের এপিডিআর শাখাগুলি এই শ্রমিকদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে।

এরই মধ্যে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে দু'-তিনটি পরিবারের ব্যক্তিরা আমাদের সহযোগিতা চেয়ে যোগাযোগ করেছে। বৃদ্ধ পিতাকে পুত্রের নির্যাতন ও বধু নির্যাতনেরদু'টি ঘটনায় শাখা নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা কাজও হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার এখানে অবকাশ নেই।

ভারভারা রাওসহ অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে এবং বর্তমানে শ্রমজীবী মানুষের ওপর যে নির্যাতন নামিয়ে আনা হয়েছে তার প্রতিবাদে বেহালা শাখা শখের বাজার অঞ্চলেপোস্টারিং করেছে ১৬/০৫/২০২০।

এ পি ডি আর, হরিদেবপুর:

আমাদের শাখা করোনা লক-ডাউন সময় কালে সামজিক সাহায্যমূলক কাজের সাথে নিজেদের যুক্ত করে।

আমাদের মুল কাজের জায়গা হরিদেবপুর থানা এলাকাধীন মুচিপাড়া, নেতাজি সড়ক, সোদপুর ডাক্তারবাগান অঞ্চলে গরীব খেটে খাওয়া মানুষের সাহাযার্থে সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাথে যৌথভাবে ৬ ই মার্চ থেকে এ যাবৎ পাঁচ দফায় খাদ্যসামগ্রী(চাল ডাল আলু মুড়ি) ও মাস্ক বিলিতে অংশ গ্রহণ করেন। অঞ্চলের মানুষের সংগঠন ও কর্মীদের প্রতি আস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

এপিডিআর, পূর্ব কলকাতা শাখা:

বিশ্বজুড়ে নভেল করোনা (covid19) ভাইরাস সংক্রমণের ফলে অতিমারির জন্য পৃথিবী তথা দেশ, আমাদের রাজ্য, যে ভয়াবহ সঙকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা এককথায় অকল্পনীয়। বিশেষ করে গরীব খেটে খাওয়াজনের। এই অতি সঙকটজনক পরিস্থিতিতে এপিডিআর, পূর্ব কলকাতা শাখা ও পূর্ব কলকাতা বিদুষক নাট্যমণ্ডলীর তরফে যৌথভাবে কিছু রিলিফ দেওয়া হয়। বেলেঘাটা শান্তি সঙঘ স্কুল সংলগ্ন ট্যাংরা, ধাপার বস্তিতে চাল, ডাল, আলু, তেলের প্যাকেট, সাবান বিলি করা হয় ধারাবাহিক ভাবে। এই সঙকটের সময়, এপিডিআর, পূর্ব কলকাতা শাখা ও পূর্ব কলকাতা বিদুষক নাট্য মন্ডলী সাধ্যমত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের চেষ্টা করেছে।

এ পি ডি আর –র উত্তর কলকাতা:

রাষ্ট্রের হটাৎ করে চাপিয়ে দেওয়া লক-ডাউন –এ শহরের শ্রমজীবী মানুষ আতান্তরে পড়েছেন, সরকারী ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়, এই অবস্থায় 'এ পি ডি আর' –র উত্তর কলকাতা শাখার সদস্যরা নিজের অঞ্চলে নানাভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, সরাসরি নিজেদের ব্যানারে না হলেও লক-ডাউনের প্রথম দিন থেকে তাঁরা বিভিন্ন যৌথ উদৌগে সামিল আছেন। ডাঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত লক-ডাউনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে নিজের পাড়া সিমলাতে প্রতি সপ্তাহে দু দিন করে ২৫ থেকে ৩২ জন প্রান্তিক মানুষকে রেশন দিচ্ছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে যুক্ত। প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা অনুদান তিনি একাই সংগ্রহ করেছেন, সাথে সাথে নিজের দুটি গাড়িকে কমিউনিটি কিচেনগুলিতে চাল-ডাল সরবরাহ থেকে আমাদের খাবার দেবার কাজে নিয়মিত ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বরাহ নগরের 'কোয়ারেন্টাইনড স্টুডেন্ট ইয়ুথ নেটওয়ার্ক' –র রান্নাঘর থেকে খাবার কলেজ স্ট্রীটের কলকাতা ইউনিভার্সিটির ফুটপাত বাসী ও প্রান্তিক মানুষদের পৌঁছে দেওয়া ও বিতরণ করার কাজে আমাদের দুই সদস্য সন্দীপ মল্লিক ও পাভেল চক্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, সন্দীপ মল্লিক নিজের গাড়ি ব্যবহারের জন্য দিয়েও সাহায্য করেছেন। লক-ডাউনের প্রথম পর্যায়ে প্রতিদিন প্রায় ১০০ প্যাকেট খাবার রোজ কলেজ স্ট্রীটে বিতরণ করা হয়েছে। লকডাউওনের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'কোয়ারেন্টাইনড স্টুডেন্ট ইয়ুথ নেটওয়ার্ক' – র সাথে যৌথ উদ্যোগে মুরারিপুকুর অঞ্চলে রান্নাঘর খোলা হয়। এই রান্নাঘরে প্রতিদিন ৩৫০প্যাকেট খাবার তৈরী হচ্ছে, মুরারীপুকুরে ১৭০টি প্যাকেট বিতরণের পর ১৮০ প্যাকেট কলেজ স্ট্রীটে বিতরণ হচ্ছে, (বরাহনগর দূর হওয়াতে ওখান থেকে খাবার আসা বন্ধ হয়)। এই রান্নাঘর স্থাপন, রসদ যোগানো ও খাদ্য বিতরণে ওপরে উল্লিখিত আমাদের শাখার তিন সদস্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। আমাদের আরেক সদস্য সজল মিত্র নিজ বন্ধু-বান্ধব ও পাড়ার উৎসাহী লোকজনকে একত্রিত করে নিজ এলাকা সুকিয়া স্ট্রীটে আজ প্রায় ৪৫দিন ধরে ৩৫০ দরিদ্র মানুষের অন্নের ব্যবস্থা করে চলেছেন। বাদুরবাগানে ওনাদের রান্নাঘর চলছে। এই উদ্যোগগুলি ছাড়াও আমরা যখনই ফোন, হয়াটস অ্যাপ, ফেসবুকে আমাদের এলাকার কোনও সহনাগরিকের সাহায্যের আবেদন পাচ্ছি, কাল বিলম্ব না করে রেশন, ওষুধ, বাজার ইত্যাদি পৌঁছে দিচ্ছি। সেই বিবরণ দিয়ে

এই লেখাকে আর দীর্ঘায়ত করবো না।এছাড়াও আমাদের সদস্যরা নিজের এলাকার বাইরেও বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে আছেন, অনুদান পাঠিয়েছেন, শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর উদ্যোগে সাহায্য করছেন। উত্তর কলকাতা শাখার সদস্যরা দৈহিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিক উদ্যোগে সর্বদা অংশগ্রহণ করছেন, রাস্তায় আছেন।

লক-ডাউনের সময়ে উত্তরবঙ্গের শাখাগুলির কাজকর্ম

শিলিগুড়ি :

শিলিগুড়িতে শাখা অফিস প্রতিদিনই খোলা হয়েছে। সদস্যরা এসেছেন। শাখা অফিস থেকে নিয়মিত ত্রাণ শিবির পরিচালনা করা হয়েছে। গড়ে ৩০-৪০ জন মানুষকে প্রতিদিন আলু এবং চাল তুলে দেওয়া হয়েছে মানবিক সাহায্য হিসেবে। শহরের বাইরেও তিনটি জায়গায় ত্রাণ শিবির পরিচালনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষই এই ত্রাণ শিবিরের জন্য আবেদন করেছিলেন।

মালদা :

বর্তমান করোনা সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে আমাদের এপিডিআর, মালদা শাখার কর্মীরা মালদা শহর সংলগ্ন বাহান্ন বিঘা এবং বাগবাড়ী অঞ্চলে গরীব এবং প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে ত্রাণ এবং চিকিত্সার কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করি এই সমস্ত এলাকায় বিপুল সংখ্যক কাজ

হারানো প্রান্তিক ও গরীব মানুষ কোন রকম রেশন কিংবা খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছেন না। খোজ নিয়ে জানা গেল আমাদের সমগ্র জেলায় এই কারণে হাজার হাজার গরীব মানুষ এসময়ে প্রায় অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এদের প্রায় সকলেই দীর্ঘদিন আগে রেশন কার্ডের আবেদন জানিয়েও রেশন কার্ড পাননি এবং এছাড়াও বিভিন্ন কারণে এদের কোন রেশন কার্ড নেই। স্বাভাবিকভাবেই এরা সকলেই অর্ধাহারে কিংবা অনাহারে রয়েছেন। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের জেলার ক্ষেত্রে একটা বড় উদ্বেগের সেটা হলো, মালদা জেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক কাজ হারিয়ে ফিরে আসছেন। অভিযোগ আসছিল এদের অনেককেই কোন রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে আমাদের জেলার গ্রামাঞ্চলে গোষ্ঠী সংক্রমণ এর আশংকা বাড়ছে ইতিমধ্যে আমাদের এই আশংকার বাস্তব প্রিতফলন জেলাতে ঘটতেও শুরু করেছে। আমরা এপিডিআর মালদা শাখার পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিলাম। গত 12 মে সদর মহকুমা আধিকারিক এবং জেলা সমাহর্তা র সাথে মালদা শাখার সভাপতি নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সহ - সভাপতি গৌতম চৌধুরী র নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধি দল সমস্যা গুলি আলোচনা করেন।আমাদের এই প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দিয়ে নির্দ্দিষ্ট ভাবে দাবি জানানো হয, জেলার সমস্ত কাজ হারানো গরীব মানুষদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করতে হবে। আমাদের দ্বিতীয় দাবি ছিল, আমাদের জেলাতে বাইরে থেকে আসা সমস্ত শ্রমিকদের আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সুস্থ্য শ্রমিকদের দ্রুত তাদের বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অসুস্থদের উপযুক্ত চিকিত্সার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্মারকলিপিতে উল্লিখিত দাবিগুলির সাথে ওনারা সহমত পোষণ করেন। তবে তারা বলেন বিষয়গুলি সমাধানের ক্ষেত্রে তারা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে কার্ড নেই এরকম গরীব মানুষদের রেশন দেওয়ার বিষয়ে সরকারি নির্দেশ না পেলে ওনাদের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয় বলে জানান। এই কর্মসূচি র পরে আমারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই দাবীগুলি আদায়ের জন্য রাস্তায় নেমে আন্দোলনের রূপরেখা আমাদের ঠিক করতে হবে ॥ তবে এই দাবীগুলী এবং অনান্য দাবি নিয়ে ব্যাপক ভাবে পোস্টারিং এর কর্মসূচি আমরা নিই। গত 13 মে থেকে 22 মে অবধি শহর জুড়ে পোস্টারিং করা হয। এছাড়াও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম 22 মে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গুলির ডাকে শ্রম আইন সংশোধন সহ শ্রমিক বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ গুলির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে তার দাবিগুলোর সাথে আমরা সহমত পোষণ করছি। সেকারণে ওইদিন এপিডিআর মালদা শাখার পক্ষ থেকে একক ভাবে এই আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে শহরে কর্মসূচি পালন করবো। অতি বৃষ্টির কারণে সেইদিন সেরকম কোন কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয়নি। আগামী 31 মে আমরা আমাদের সভা আহ্বান করেছি এপিডিআর অফিসে, সেখান থেকে এই দাবিগুলির সমর্থনে ও অনান্য বিষয়ে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করবো।

আলিপুরদুয়ার :

সেই অর্থে শাখাগত কোনও কর্মসূচি নেই। যদ্যপি বনগ্রাম এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় প্রবল অনিশ্চিত অবস্থায় থাকা মানুষের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেবার কর্মকাণ্ডগুলিতে শাখার সদস্যরা নিয়মিত যুক্ত থেকেছেন। এই ধরনের কাজগুলি করতে সরকারি অনুমোদনের ব্যাপারে শাখা কিছু সাহায্য করতে পেরেছে। করোনা আতঙ্কে রাস্তা আটকে দেওয়া বা পুলিশ কর্তৃক টোটো আটকে দেওয়া - এ ধরনের কিছু বিষয়ে শাখা হস্তক্ষেপ করেছে এবং তাতে কাজ হয়েছে।

নদীয়া জেলা:

লক-ডাউন ডায়েরি — কৃষ্ণনগর (ত্রাণবিলি, তথ্যানুসন্ধানের রিপোর্ট এবং আশু কর্মসূচি)

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন ইতিমধ্যেই তিনশোরও বেশি মানুষ (মূলতঃ পরিযায়ী শ্রমিক) অনাহারে, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে বাড়ী ফেরার পথশ্রমে অথবা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) Covid-19 কে অতিমারী ঘোষণা করার পর করোনা আক্রান্ত দেশ গুলো থেকে এদেশের সরকার প্লেনে করে এগারো দিন ধরে অভিবাসী দের এদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে ঘোষণা করা হয় দেশ জোড়া লক-ডাউন। আর তার ফলেই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের জীবন জীবিকার উপর নেমে আসে এক ভয়ংকর দুর্যোগ। এই লক-ডাউনের চতুর্থ পর্যায় শুরু হল 17 মে থেকে। এমনই এক পরিস্থিতিতে কৃষ্ণনগর APDR কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রথমত, সংগঠনের সদস্য এবং সমমনস্ক শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে খোলা হয় একটি Whatsapp গ্রুপ। করোনা সংক্রান্ত তথ্য এবং এই বিপন্ন সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কর্মসূচি স্থির করা এবং মতামত বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সমাজমাধ্যমের এই Covid-19 APDR গ্রুপ। আলোচনা সাপেক্ষে স্থির হয় যে আকস্মিক লক-ডাউন ঘোষণায় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার রসদটুকু নিশ্চিত করতে এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের ত্রাণবিলি করা জরুরি। যদিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রাখা প্রয়োজন যে, APDR ত্রাণের দর্শনে আস্থা রাখেনা। কারণ ত্রাণ কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। না পাওয়া মানুষের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করা APDR এর প্রধান কাজ। সরকারী আনুকূল্যে রেশন ব্যবস্থার পর্বত প্রমাণ দুর্নীতির ফাঁক গলে যে ছিটে ফোঁটা খাদ্যসামগ্রী ঐ মানুষ গুলোর কাছে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত যাতে তারা অন্ততঃ টিকে থাকতে পারে সেই কারণেই প্রধাণত ত্রাণ বিলির কাজ হাতে নেওয়া হয়। প্রথামাফিক সদর মহকুমা শাসকের অনুমতি সাপেক্ষে শুরু হয় আমাদের ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার কাজ। সংগঠনের প্রায় সকল সদস্যই নিজেরা অর্থ দেওয়া এবং ব্যক্তিগত সূত্রে পরিচিত শুভানুধ্যায়ী মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজটি চালিয়ে যেতে থাকেন। সংগৃহীত অর্থে আমরা এপ্রিলের 1/04/2020 তারিখ থেকে মে মাসের 24/05/2020 তারিখ পর্যন্ত শহর কৃষ্ণনগর এবং নদীয়া জেলার বেশ কিছু গ্রামে খাদ্য সামগ্রী বন্টনের বন্দোবস্ত করি। ত্রাণ বন্টনের সাথেই চলতে থাকে সেই মানুষ গুলোকে অধিকার সচেতন করার কাজ এবং ত্রাণ কার্যের সাথে চলতে থাকে তথ্যানুসন্ধান। আর এই তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়েই আমরা মুখোমুখি হই কিছু আর্থ সামাজিক সত্যের। আমরা জানতে পারি পরিযায়ী/অতিথি শ্রমিকের সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক।

গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকে একজন বা দুজন বাংলার বাবে অন্যান্য রাজ্যে কাজ করেন একটু বেশি রোজগারের আশায়।এরা অধিকাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রের অদক্ষ শ্রমিক। মূলতঃ জোগাড়ে বা রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে এঁরা যুক্ত। মাসান্তে এদের পাঠানো উপার্জিত অর্থেই চলে এঁদের ফেলে আসা পরিবার। এই পরিবার গুলির প্রায় কারোরই নিজের জমি নেই। কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন অন্যের জমিতে। মহাজনের ঋণশোধ থেকে কৃষির আনুসাঙ্গিক খরচ সবই করতে হয় ভিনরাজ্যবাসী সদস্য টির পাঠানো টাকায়। সঙ্গে আছে পরিবারের খরচ। আকস্মিক লক-ডাউনে ভিনরাজ্যবাসী এই শ্রমিকদের কাজ বন্ধ, ফলে আয় ও সঞ্চয় চলে এসেছে শূন্যের কাছাকাছি। সুতরাং বন্ধ হয়ে গেছে ভিনরাজ্য থেকে আসা অর্থের যোগান। ঋনে জর্জরিত পরিবারগুলো আজ সর্বস্বান্ত হয়ে পথের প্রান্তরে অপেক্ষায় থাকে ত্রাণের। এর মধ্যে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকেরা ফিরে আসছেন দলে দলে। গ্রামে কাজ নেই, অর্থাৎ বুভুক্ষু মুখ ক্রমশ বাড়ছে গ্রামে, বাড়ছে জমির উপর চাপ অথচ আয়ের রাস্তা সব দিক থেকে বন্ধ।

এ সত্য আমরা জেনেছি আমাদের ত্রাণ বিলির অনুসঙ্গে। তাই আমরা সর্বত্র দাবী রেখেছি মানুষের হাতে হয় কাজ চাই নাহলে চাই টাকা।

এর সঙ্গে আমরা তথ্যানুসন্ধান করেছিলাম কৃষ্ণনগর শহরের টোটো চালকদের মধ্যে। লক-ডাউনের আগে স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব আমাদের অবাক করেছে। শহরে যখন প্রথম টোটো আসে তখন মালিক ও চালক ছিলেন আলাদা ব্যক্তি। দিনের শেষে মালিকের হাতে উপার্জিত অর্থের সিংহভাগ তুলে দিয়ে অল্প কিছু হাতে নিয়ে তারা বাড়ী ফিরতেন। কালক্রমে ব্যাংক ঋণের দৌলতে এখন প্রায় সমস্ত টোটো চালক এবং মালিক একই ব্যক্তি। তাদের মাসিক যায় 10000/- থেকে 12000/- টাকা। সময় বিশেষে তা 15000/- টাকাও হয়। এবার আসা যাক ব্যয়ের প্রসঙ্গে। ব্যাটারি ও ইলেকট্রিক চার্জ বাবদ খরচ প্রায় 5000/- টাকা। রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত খরচ প্রায় 1000 টাকা বা তার বেশি। ব্যাংক লোনের মাসিক প্রদেয় EMI বাবদ 1000 টাকা, সঙ্গে মাসিক প্রদেয় চাঁদা 250 টাকা। আয় ব্যয়ের এই হিসাব থেকেই টোটো চালকদের প্রকৃত আয় সহজেই অনুমেয়। এর সঙ্গে লক-ডাউনের গেরোয় সেই ন্যূনতম আয় টুকুও যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শহরের প্রায় 2500 টোটো চালকের পরিবারকে ত্রাণের জন্য রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই হয়।

এছাড়া কৃষ্ণনগর শহরে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করতে আসা শ্রমিক দের মধ্যেও একটি সমীক্ষা চালিয়েছে কৃষ্ণনগর APDR.. দৈনিক 350-400 টাকা মজুরীর বিনিময়ে মাসে 15-20 দিন কাজ পাওয়া এই শ্রমিক রা এখন একেবারেই কর্মহীন। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, কৃষ্ণনগর শহরের পার্শ্ববর্তী ধুবুলিয়া, বেলপুকুর, সোনডাঙ্গা, ভান্ডারখোলা, জাভা, দোগাছি, চিত্রশালি প্রভৃতি এলাকা থেকে আসা এইসব শ্রমিকদের দের অনেকেরই একশো দিনের কাজের জব কার্ড থাকলেও অধিকাংশই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কুক্ষিগত হয়ে আছে। ফলে এদের জব কার্ড থেকেও নেই। তাই দিনমজুরিই এঁদের একমাত্র ভরসা। আকস্মিক লক-ডাউন ঘোষণার ফলে এদের কাজ বন্ধ, তাই রোজগারের পথও বন্ধ। এমতাবস্থায় এইসব শ্রমিক পরিবারের কাছে ত্রাণই একমাত্র পরিত্রাণের রাস্তা।

এর সঙ্গে আছে রেল ও রাস্তার হকার, ফুটপাতের ছোট দোকান। লক-ডাউনে সবই বন্ধ থাকায় এই অংশের সাথে যুক্ত মানুষদের কাজ নেই, তাই আয়ও শূন্য।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে কৃষ্ণনগর APDR গত 03/05/2020 তারিখে নদীয়ার জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। তাতে প্রধানত এই দাবীটি করা হয় যে, আয় বন্ধ হওয়া মানুষগুলোর পরিবারের হাতে ন্যূনতম 10000-15000 টাকা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তুলে দেওয়া হোক। এর সঙ্গে গণবণ্টন ব্যবস্থা কে দুর্নীতি মুক্ত করে অবিলম্বে প্রত্যেক পরিবারের হাতে চাল ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হোক।

এছাড়াও আমাদের দাবী ছিল অবিলম্বে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরার এবং তাদের উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

এরপর গত 15/05/2020 তারিখে কৃষ্ণনগর APDR এর সদস্যরা পরিযায়ী শ্রমিকদের(প্রধানতঃ যাঁরা নদীয়া জেলা থেকে ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন এমন প্রায় জনের) একটি তালিকা DISASTER MANAGEMENT OFFICER এবং ADM(G) এর হাতে তুলে দেয়।

আমরা মনে করি এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রক্রিয়ার অংশ। শুধুমাত্র ত্রাণ এবং ডেপুটেশন দিয়ে প্রকৃত সমাধান সূত্র পাওয়া এক অলীক কল্পনা। তাই কৃষ্ণনগর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, করোনা কে সামনে রেখে রাষ্ট্রের এই অমানবিক কার্যক্রমের প্রকৃত স্বরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। তাই রাস্তায় নেমে, 'শারীরিক দূরত্ব' বিধি মেনে মানুষকে সংগঠিত করতে প্রতিবাদের রাস্তায় হাঁটার কর্মসূচিও গ্রহণ করেছেকৃষ্ণনগর APDR।

Krishnagar Branch managed to collect Rs.179640.00(one lakh seventy nine thousand six hundred forty only from members & well wisher. Already have send Rs 25000.00 to the stranded labors at Hyderabad,Bngalure,Kerala & Mumbai. and rest of Rs.154000.00 relief work (cost of food grain,soap,musk,eggs,vegetable including vehicle charge.)

লক-ডাউন পর্যায়ে হুগলি জেলার বিভিন্ন শাখার কর্মসূচি

কোভিড-১৯ কোরোনা ভাইরাসের আক্রমণে বর্তমানে যে লক-ডাউন পরিস্থিতি চলছে এই অবস্থায় আমাদের হুগলি জেলার বিভিন্ন শাখার সদস্য সদস্যরা তারা সামগ্রিকভাবে প্রকাশ্যে কোনো প্রচার বা কোনো কর্মসূচি পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রিবেণী থেকে শুরু করে ডানকুনি পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় অন্য অঞ্চলের শ্রমিকরা কর্মসূত্রে (যাদের পরিযায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে) বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং তাদের তালিকা তৈরী করা হয়। এ.পি.ডি.আর এর হুগলী জেলার বিভিন্ন শাখা এবং সামগ্রিকভাবে হুগলী জেলার পক্ষ থেকে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাপনায়। এই বিষয়ে আমরা আমাদের হুগলি জেলার প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের (জেলা শাসক, এস.ডি.ও.(চন্দননগর, শ্রীরামপুর, বলাগড়), চন্দননগর পুলিশ কমিশনার, বিভিন্ন থানা (বলাগড়, রিষড়া, উত্তরপাড়া, ডানকুনি) এর সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করেছি এবং সরকারি নির্দেশ মত আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে,তালিকা তৈরি করে অফিস গুলিতে জমা দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সমর্থ হয়েছি। কয়েকটি অঞ্চলের শ্রমিকেরা তাদের নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পেরেছে। যেমন খামারগাছি অঞ্চল থেকে ১৩১ জনের একটি দল তারা বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ফিরে যেতে পেরেছে। ৩২ জনের একটি দল আমাদের রাজ্যের রিষড়া থেকে পুরুলিয়ায় ফিরে যেতে পেরেছে। কিন্তু এখনো বেশ কিছু শ্রমিক তারা তাদের নিজেদের বাসস্থানের ফিরে যেতে পারেনি। ডানকুনি শিল্পাঞ্চলে যে ছোট-মাঝারি কারখানার শ্রমিকেরা (ডানকুনি শাখা ও সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে ৩৫২ জন শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া যায়) ইতিমধ্যেই কারখানা বন্ধ থাকার কারণে খুবই বিপর্যস্ত। তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারছে না। আমরা বারংবার প্রশাসনের কাছে চেষ্টা করেছি এই সমস্ত মানুষদের ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সরকারি ঔদাসীন্যর জন্য এখনও পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। এছাড়া জেলা

জুড়ে বিভিন্ন ইটভাটায় হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক অসহনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

এছাড়া আমাদের এ.পি.ডি.আর. এর বিভিন্ন শাখার সদস্যরা কোথাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোথাও অন্য মানবিক ভাবাপন্ন সংস্থা, সহৃদয় মানুষের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তাদের স্থানীয় অঞ্চলে দুস্থ মানুষের খাবারের, ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন। কোথাও এখনো পর্যন্ত প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও ব্যবস্থা করছেন।

বলাগড়-খামারগাছি স্কুলে প্রায় ১৩১জন বিহার অঞ্চলের শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা এবং গত ১৩ই এপ্রিল থেকে ১১দিন যাবৎ তাদের খাবারের ব্যবস্থা বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী শাখার উদ্যোগে করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাজ্য প্রশাসন ও অন্য সংস্থার উদ্যোগে খাবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শ্রীরামপুর শাখার রিষড়ায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ১৫টি পরিবার গৃহহারা হয়ে একটি স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। এদের প্রায় ৩৫ জনের জন্য একটি কমিউনিটি কিচেন চালানোর ক্ষেত্রে এলাকার অন্যদের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করছে এ. পি. ডি. আর এর কর্মীরা।

চন্দননগরে প্রায় ২০০ জনের মত মানুষ কে সরকারি সহযোগিতায় রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখা গত ৫১ দিন ধরে ১২০ জন মূলত উত্তরপাড়া রেলস্টেশন এবং উত্তরপাড়া হাসপাতাল অঞ্চলের মানুষদের প্রতিদিন দু'বেলা খাবারের রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করে চলেছে।

আরামবাগ শাখার সদস্যরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন ফলে তারা একত্রে কোনো কর্মসূচি নিতে না পারলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের স্থানীয় অঞ্চলে বিভিন্ন রকম দুঃস্থ মানুষদের সাহায্য করেছেন বা এখনো করে চলেছেন।

চুঁচুড়া শাখার সদস্যরা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই অঞ্চলে দুঃস্থ মানুষদের সাহায্য করেছেন।

গত ১০ই ও ১২ই মে'২০২০ হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত তেলিনিপাড়া অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দোকান,বাড়ী গাড়ী,তে অগ্নিসংযোগ,লুট, মন্দির-মাজার ভাংচুর, সাধারণ মানুষের সম্পত্তির বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়। এ.পি.ডি.আর., হুগলি জেলার পক্ষ থেকে একটি তথ্যানুসন্ধানী দল ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করে। এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন এই সংখ্যায় আলাদা করে প্রকাশ করা হয়েছে।

চন্দননগর এস.ডি.ও. চন্দননগর পুলিশ কমিশনার এর কাছে আমাদের তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ দের পুনর্বাসন, যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ ও অসুস্থ রোগী এবং দশ মাসের সন্তান এর মা কে জামিনে মুক্ত করার দাবি জানান হয়েছে।

দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে জেলা শাসকের নির্দেশে চন্দননগর ও শ্রীরামপুর মহকুমা অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর বিরুদ্ধে জেলা শাসকের কাছে প্রতিবাদ পত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

লক-ডাউনের কারণে শারীরিক উপস্থিতির বিকল্প হিসেবে আমরা জেলার সমস্ত শাখার সঙ্গে (আরামবাগ শাখা ছাড়া) সাপ্তাহিক "টেলি-কনফারেন্সিং" এর মাধ্যমে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় এপিডিআর কর্মী সহ ১১জন প্রতিবাদী মানুষকে গ্রেপ্তার

জল ও বিদ্যুতের দাবিতে গত ২৪ মে সোনারপুর থানা এলাকার মানুষজন সোনারপুর বিডিও-র সঙ্গে কথা বলতে চান। বিডিও দেখা না করায় মানুষজন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এরপর বিডিও পুলিশ ডাকেন। পুলিশ এসেই নির্বিচারে জনতাকে মারধর শুরু করে। এমনকি মহিলাদেরও বাদ দেয় না! স্থানীয় মানুষজন এভাবে মারধরের ঘটনার আপত্তি জানান। পুলিশের লাঠিপেটায় আহতদের স্থানীয় মানুষ শুশ্রূষা করার চেস্টা করলে পুলিশ তাঁদেরও মারধর করে। পুলিশের এই বর্বর আচরণের আপত্তি করায় পুলিশ এপিডিআর কর্মী সরোজ বসু সহ ১১জন প্রতিবাদী মানুষকে গ্রেপ্তার করে।

সোনারপুর থানা তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার অভিযোগসহ মারাত্মক সব ধারা দিয়ে পরদিন তাঁদের বারুইপুর কোর্টে চালান করে। আদালত তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজত দেয়। বারুইপুর কোর্টে উকিলকে এ পি ডি আর প্রশ্ন করায় তাঁকে লোকজন এনে প্রথম দফায় প্রচন্ড মারধর করে বসিয়ে রাখা হয়। আবার দ্বিতীয় দফায় নির্মমভাবে মারধরও করা হয়।

পুলিশ প্রশাসনের এই ধরনের অন্যায় ও বেআইনি কাজকর্মের আমরা তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে সরোজ বসু সহ ১১ জনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছি।

CDRO

জাতীয় চালচিত্র

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ CDRO (কো-অর্ডিনেশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইট্স্ অর্গানাইজেশনস্)-এর পক্ষ থেকে করোনা আবহে এই সমস্ত সংগঠনগুলির ভাবনাচিন্তা ও কর্মধারার সাযুজ্য তুলে ধরার প্রচেষ্টা হিসাবে এই প্রতিবেদন।

কোভিড-১৯ কে বর্ম করে এবং বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি নিজেদের অপদার্থতা, দুর্নীতি এবং অর্থনীতির কঙ্কালসার চেহারাটি ঢাকতে চাইছেন। মনে পড়ে, ২০০৭ সালে প্রকাশিত কানাডার লেখক ও সমাজকর্মী নাওমি ক্লাইনের লেখা "দ্য শক ডকট্রিন : দ্য রাইজ অফ ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম"। এখানে লেখক বলেছেন, "বিপর্যয় কেবল মুনাফা বাড়ায় না, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে নিও-লিবারেল অর্থনীতির চালকদের আধিপত্য আরও জোরদার করতে সহায়তা করে"। মনে রাখা দরকার, করোনা ভাইরাসের মানবশরীরে সংক্রমণের ঘটনা বিনা কারণে ঘটে নি। বাজার অর্থনীতির উপর নির্ভরশীলতা শুধু ভারতবর্ষ নয়, প্রথম বিশ্বের দেশগুলিরও মানবিক মুখোশ সম্পূর্ণ খুলে দিয়েছে। ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্যের কঙ্কালসার চেহারাটি উন্মুক্ত করেছে।

করোনা কিন্তু ভারতবর্ষের মুখ্য হুমকি (main threat) নয়, অথচ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম সেটাই প্রচার করতে চাইছে। এবং এই কাজে তারা প্রধানত সফলও বটে। বিশেষত শিক্ষিত (?) মধ্যবিত্ত জনসমাজে তারা এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে "ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আক্ট"-এর হুমকি, যা আসলে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার এক হাতিয়ার। যদিও এই আইনে কিছু মানবিক ভাবনার সংস্থান আছে। যেমন, এই আইন বলবৎ থাকাকালীন প্রত্যেক নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সুযোগ আছে।

সারা ভারতবর্ষে 'পরিযায়ী' বা অতিথি শ্রমিকদের সংখ্যা দশ কোটিরও বেশি। যাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে। যাঁরা ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

বস্তুত বিশ্ব অর্থনীতির প্রচলিত ব্যবস্থা, গতিপ্রকৃতি এমনকি তার কাঠামোটিও আপাতত বড় অনিশ্চয়তার সম্মুখীন ! এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন ইতিমধ্যেই ৪০০র বেশি মানুষ (যাদের আমরা পরিযায়ী বা অতিথি শ্রমিক বলছি, তারা) অনাহারে মাইলের পর মেইল হেঁটে বাড়ি ফেরার পথশ্রমে অথবা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) Covid-19 কে অতিমারী ঘোষণা করার পর করোনা আক্রান্ত দেশগুলো থেকে এদেশের সরকার প্লেনে করে এগারো দিন ধরে অভিবাসীদের ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে ঘোষণা করে দেয় দেশজোড়া লক-ডাউন। তারই ফলশ্রুতিতে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের জীবনের উপর নেমে আসে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। কাজ বন্ধ। মালিক বা ঠিকাদারেরা এই দুঃসময়ে কোনও দায়িত্ব নিতে চাইছে না। শ'য়ে শ'য়ে এমনকি হাজার মাইল পায়ে হেঁটে চলেছেন অনাহার ক্লিষ্ট শ্রমিকরা। সঙ্গে রয়েছেন মহিলা এবং বাচ্চারাও। পুলিশের ভয়ে রাজপথ এড়িয়ে মেঠোপথ বা রেলপথ ধরে এগিয়ে চলেছেন বাড়ির টানে। পথে জুটছে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর লাঠি, লক-ডাউন অমান্য করার দায়ে। আসন্ন প্রসবা মা হাঁটছেন – পথেই প্রসব, দুঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার হাঁটা। এ কোন দেশ, কোন রাষ্ট্র ? দেশ নেতা-নেত্রীদের আড়খ্যামটা টেলিভিসন ভাষণ "ঘর থেকে বেরোবেন না, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বজায় রাখুন"। অস্বীকার করে লাভ নেই, এই অজ্ঞতা ও উদাসীনতার শরিক ছিলাম আমরাও। আর এঁদের কি করে পরিজায়ী শ্রমিক বা অতিথি শ্রমিকের নামকরণ করলাম ? এরা তো ভারতেরই সন্তান, দেশের যে কোন প্রান্তে কাজ করবার অধিকার এদের আছে। সংবিধানের মৌলিক অধিকার আছে। এর মাঝে চলেছে হিন্দুত্ববাদী আচরণের প্রয়োগ। ঘন্টা বাজিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, হাততালি দিয়ে লক-ডাউনকে স্বাগত জানানো। আবার যত দোষ মুসলিম শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপানো, ওরাই নাকি 'করোনা' আমদানি করছে ভিন রাজ্য থেকে।

দেশের সরকার, যারা নির্বাচনে জিতে এসে প্রতিটি নাগরিকের জান ও মানের সুরক্ষার দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছে, এই প্রায় ৮ কোটি প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষদের অস্তিত্ব তাদের ভাবনা বলয়ে ছিল না। অভিবাসী এইসব শ্রমিকদের নিয়ে সরকারের উদাসীনতা ও অদূরদর্শিতা কি শুধুমাত্র তাদের অকর্মন্যতা, নাকি প্রশাসনিক মিস্ম্যানেজমেন্ট, নাকি নতুন করে শস্তা শ্রম নির্মাণের রূপরেখা ! ৮৩৯ কোটি টাকা (?) খরচ করে কোভিড হাসপাতালগুলির উপর পুষ্পবৃষ্টি (বায়ুসেনা মারফৎ) কোন মানসিক উন্মাদনা ? অথচ শ্রমিকদের ট্রেনের ভাড়া নিয়ে কাল কাটানোর বিলাসিতা এই মূহুর্তে প্রকটভাবে চোখে পড়েছে।এশ্রমিকদের ঘরে ফেরার টাকা নাকি মকুব করা যাবে না। আবার কোভিড সংকটের সময় উৎপাদন বাড়ানোর অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে দানবিক শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী আইন লাগু করা হল। রুটি, রুজি, রেললাইনের উন্নয়নের চাকায় পিষে যাওয়া শ্রমিকের লাশ এই সভ্যতার রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার নগ্ন রক্তাক্ত রূপকে আরও একবার স্পষ্ট করল।

করোনার আবহে অন্যচোখে তামিলনাড়ু

ভারতের গাড়ি উৎপাদন, বয়ন এবং নির্মাণ ক্ষেত্রের জগতে তামিলনাড়ু রাজ্য একটি বড় নাম। ফলত: শ্রমিকদের আন্ত:রাজ্য পরিযায়নের ক্ষেত্রেও তা একটি লোভনীয় স্থান। সরকারী হিসেবেই এখানে অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকের সংখ্যা দশ লক্ষ। যদিও তা বাস্তবে নিশ্চিতভাবে আরও বেশি। এই শতাব্দীর প্রথমদিকে এই শ্রমিকরা কাজ করতেন মূলত নির্মাণক্ষেত্রে। আজ অভিমুখ ঘুরে গিয়েছে উৎপাদন শিল্পের দিকে বিশেষত গাড়ি নির্মাণ ক্ষেত্রে। যেখানে বড় কোম্পানির অধীনে থাকা ছোট ছোট কোম্পানি এই ধরনের শ্রমিকদের কর্মস্থল। হোণ্ডাই অথবা নিশানের মত বড় কোম্পানিতে এই ধরনের শ্রমিকরা গণ্য হন অদক্ষ কর্মী হিসাবে। কিন্তু অনুসারী শিল্পক্ষেত্রে এই পরিযায়ী শ্রমিকরা কারখানাতেই কাজ করে। এই রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় মুখ্যত কাঞ্চীপুরম, চেন্নাই এবং তিরুপুর অঞ্চলে। গৃহস্থালি এবং সিকিউরিটি গার্ডের কাজে একচেটিয়া আধিপত্য বাংলা, ওড়িষ্যা, আসাম, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় থেকে যাওয়া হাজার হাজার হতভাগ্যের। ত্রিপুর এবং কোয়েম্বাটুরে বয়ন শিল্পে কাজ করা শ্রমিকদের এক বড় অংশ সম্প্রতি সেখানে আসা বিভিন্ন প্রদেশের মহিলা শ্রমিকরা। বেশ কিছু কিশোরী চেন্নাইতে এই শিল্পে কাজ করছেন ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস থেকে। অর্থাৎ লক-ডাউন শুরুর আগে কাজ করেছেন কয়েক সপ্তাহ। এদের মধ্যে অনেকেই মজুরি বাবদ কাণাকড়িও চোখে দেখেন নি। এরা মূলত: থাকেন কোম্পানির দেওয়া আবাসনে, যেখানে মালিকপক্ষের হুমকি শুনে চলাটাই দস্তুর। এখন তাদের বাইরে বেরোলেও মুশকিল। বিনা পারিশ্রমিকে সাফাইয়ের কাজও করানো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। কর্তৃপক্ষও চাইছে না তারা বাড়ি ফিরুক। কারণ উৎপাদন চালু হলেই প্রয়োজন পড়বে তাদের। এই টানাপোড়েনে তারা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত।

তৃতীয় দফার লক-ডাউনে শ্রমিকদের একটা বড় অংশই ফিরতে চাইছেন। বিগত কয়েকদিনে তামিলনাড়ু সরকার এব্যাপারে বিভিন্ন ফর্ম ফিল আপ করার জন্য বলেছেন। একটা মাত্র উদ্দেশ্য সাধনে একাধিক ফর্ম কেন? বাড়ি ফিরতে চাওয়া উদ্ভ্রান্ত শ্রমিকদের ক্ষোভ প্রশমনে তা কি কোনও আমলাতান্ত্রিক কৌশল? নিজের পয়সা খরচ করে সাইকেলে অথবা বাসে শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার খবরও আসছে। তামিলনাড়ু থেকে সমুদ্রপথে অনেকে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার উপকূলেও চলে আসছেন।

সরকারি তরফে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না পেয়ে শ্রমিকরা নেমেছেন প্রতিবাদের রাস্তায়। চেন্নাইয়ের কাছে পাল্লাভারামে ও তিরুনেলাবলী জেলার কোডানকুলামে এল এণ্ড টি-র নির্মাণকর্মীরা গত ২মে থেকে পথে নেমেছেন। আশার আলো এটাই যে সরকারি টনক নড়েছে এবং রেলপথে তাদের ফেরানোর প্রতিশ্রুতি মিলেছে। বাস্তবে কি হয় সেটাই দেখার।

তামিলনাড়ুতে প্রথম প্রতিবাদের ঝড় ওঠে প্রথমদফা লক-ডাউনের শুরুতেই। মূলত: কেরল থেকে আসা শত শত শ্রমিক চেন্নাই এবং কোয়েম্বাটুর রেলস্টেশনে আটকে পড়েন। হঠাৎ জন-পরিবহন বন্ধ হওয়ায় তাদের অবস্থা হয়ে পড়ে ন যযৌ ন তস্থৌ। খাদ্য, পানীয় জল এবং প্রয়োজনীয় আশ্রয় হীন এই মানুষেরা নেমে আসেন রাস্তায়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরে সরকারিভাবে তাদের দুই শহরে থাকার খানিক ব্যবস্থা হয়। চেন্নাই সহ বেশ কিছু শহরে নাগরিক সমাজের একাংশ ও কিছু জন-সংগঠন লক-ডাউনের শুরুর দিনগুলো থেকেই অসহায় শ্রমিকদের খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মানুষ এখনও চরম দুরবস্থায়। তামিলনাড়ু সরকার নানান জায়গায় খানিক রেশন পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু সামান্য চাল আর ডালে কি ভুখা মানুষের পেট ভরে? কোথাও জুটেছে শুধু নুন ভাত ! রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কিছু আধিকারিককে দায়িত্ব দিয়েছে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় ন্যুনতম খাদ্য সরবরাহের জন্য ও তাদের মাথা গোঁজার স্থানের ব্যবস্থা করার জন্য। যদিও সরকারি আধিকারিকদের দেখা না পাওয়া ও অন্য প্রদেশের শ্রমিকরা স্থানীয় ভাষা না জানার ফলে এই পরিকল্পনা খুব একটা বাস্তবায়িত হয়নি।

হঠাৎ করে উপার্জনহীন হওয়ায় এই শ্রমিকরা বাড়িতে কোনও টাকা পাঠাতে পারছেন না। সরকার মালিকপক্ষকে চাপ দেওয়া তো দূরের কথা মৌখিক অনুরোধটুকুও জানায়নি। নাগরিক সংগঠনগুলোরও এব্যাপারে কার্যত কিছু করার নেই। কোভিড-১৯ সাপোর্ট গ্রুপ কেবলমাত্র খাদ্যসামগ্রী দানের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি, নানান কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের মার্চ মাসের মজুরি আদায় করার ব্যাপারে কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখেছেন। হোণ্ডাই-এর মতো নামী কোম্পানী ও শ্রীপেরাম্বুদুরের কিছু সহযোগী কোম্পানীতে এই আলোচনা সফল হয়েছে। এ ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্থানীয় নেতৃত্বকে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

এবারে আসা যাক একটু অন্য প্রসঙ্গে। এই অতিমারীর সঙ্গে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মী ও সাফাইকর্মীরা মাস্ক ও পিপিই পেয়েছেন যৎসামান্যই। করোনার সঙ্গে সরাসরি লড়াই করা একাধিক চিকিৎসক, নার্সের মৃত্যুর খবরও এসেছে। স্থানীয়স্তরে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন চেষ্টা করছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলকে চিকিৎসা ও আইনি নিরাপত্তা দেওয়ার। চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মীদের সার্বিক নিরাপত্তার দিকটি তামিলনাড়ু সরকার এখনো অবহেলা করছেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আর এস এস-এর ঘনিষ্ঠতার সুবাদে ঐ সংগঠনের সদস্যরা স্বাধীনভাবে ঘুরে সামান্যই কাজ করছেন, কিন্তু শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করা নাগরিক ও জন-সংগঠনগুলি পদে পদে বাধা পাচ্ছেন।

লক-ডাউনের আগে থেকেই এই শ্রমিকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। দেরিতে বেতন, ওপরওয়ালার গালাগাল এবং জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অতিরিক্ত সময়ের কাজ ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। যা এই

লক-ডাউনের পর্বে মাত্রা ছাড়িয়েছে। নির্মাণ ও বয়নশিল্পের বেশিরভাগ শ্রমিকই মার্চ মাসের বেতন কম পেয়েছেন। অনেকের ভাগ্যে তাও জোটেনি। সংগঠিত ক্ষেত্রেও এই শ্রমিকরা মার্চ মাসের প্রথম তিন সপ্তাহ পুরো কাজ করলেও তার জন্য আংশিক বেতন পেয়েছেন। ফলে একদিকে প্রবল অর্থকষ্ট, অন্যদিকে তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষ থেকে এক সপ্তাহেরও বেশি পরে এই শ্রমিকদের দিকে যৎসামান্য সাহায্যের হাত বাড়ানো, এই সব শ্রমিকদের ঠেলে দিয়েছিল অর্ধাহার, অনাহারের দোরগোড়ায়।

আশ্চর্যজনক ভাবে এই সংকটকালে সরকারি জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর মানুষগুলির ওপর সরকারবাহাদুর তার দমনপীড়ন জারি রেখেছেন। অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। এর আরও বৃহত্তর প্রতিবাদ প্রয়োজন। আদালত বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ ও বিচারাধীন বন্দীরা বহুদিন ধরেই ন্যায়বিচার থেকেও বঞ্চিত। অপরদিকে অনেক আইনজীবীও অর্থসঙ্কটে কোনও সরকারী সুরাহা পাচ্ছেন না। সি পি ডি আর সমস্ত স্তরের মেহনতী মানুষের অধিকার রক্ষা ও তাদের সাহায্যের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তারা আগামী দিনেও এই কাজে ব্রতী থাকবে।

মহারাষ্ট্র

প্রধানত এঁরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিষয়গুলিকে সামনে আনছেন। ইতিমধ্যেই মুম্বাই-এর আর্থার সংশোধনাগারের ৭২ জন বন্দীর সংক্রমণের বিষয়টি মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের নজরে এনেছেন। এবং দাবী করেছেন এন আই এ কোর্টে (মুম্বাই সেশন কোর্টের ৪৫ নং ঘরে), যেখানে ১২ জন রাজনৈতিক বন্দীর বিচার চলছে, এঁদের প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হোক। বিশেষত ভারভারা রাও-এর শারীরিক অবস্থা এবং বয়স বিবেচনা করতে বলেছেন। এর সাথে তাঁরা মহারাষ্ট্রের পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়টিতেও সক্রিয় হয়েছেন। সি পি ডি আর মহারাষ্ট্র সরকার ও পুলিশবাহিনীর অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এবং যথাসাধ্য এই সমস্ত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা

প্রথম থেকেই এঁরা পরিকল্পনাহীন লক-ডাউনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করেছেন। ধারাবাহিকভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থেকেছেন। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন যাতে এই সমস্ত শ্রমিকরা রেশন পান। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের কাছে শ্রমিকদের নিরাপত্তার (খাওয়া ও থাকার) দায়িত্ব নিতে বলেছেন। বিশেষত বিশাখাপত্তনম, হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ ও শিল্পতালুকগুলিতে ঘুরেছেন। সাধ্যমতো ত্রাণের কাজও করেছেন। কিন্তু তাঁরা মূলত সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছেন সরকারের আগামী দিনের "দ্য রাইজ অফ ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম"-এর ন্যারেটিভ।

তথ্যানুসন্ধান

দমদম জেলে সংঘর্ষের ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান:

২১ এপ্রিল দমদম জেলে সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচজন বন্দী মারা যান এবং প্রায় শতাধিক বন্দী আহত হ'ন। ২২ শে এপ্রিল, সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'জনতা কার্ফু'র দিনে এপিডিআর-র কেন্দ্রীয় টীম আর.জি.কর হাসপাতালে যায়; যাতে উত্তর কলকাতা ও হরিদেবপুর শাখার সাথে দক্ষিণ কলকাতা শাখার প্রতিনিধিও ছিলেন। ২৩শে এপ্রিল, যেদিন থেকে 'লক-ডাউন' শুরু হলো, সেদিন দমদম জেলের ঘটনা নিয়ে আইজি, প্রিজন-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং সেখানেও দক্ষিণ কলকাতা শাখার সদস্য উপস্থিত ছিলেন। লক-ডাউন শুরু হয়ার পরে আমরা একটি বিবৃতির মাধ্যমে বন্ধু, সমর্থক ও কর্মীদের কাছে আবেদন রাখি, যদি তাঁদের আশেপাশে কোন মানুষ অভুক্ত আছেন বা অন্য অসুবিধার শিকার অথবা সরকারি যে পরিষেবা পাওয়ার কথা, তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন – সেই বিষয়ে আমাদের জানালে, আমরা আমাদের সাধ্যমত পাশে থাকার চেষ্টা করবো। যদিও এই ব্যাপারে খুব বিরাট কিছু সাড়া আমরা পাইনি। যে গুটিকয়েক ইস্যু আমাদের সামনে এসেছিল, তা সংশ্লিষ্ট থানার মাধ্যমে প্রশাসনের গোচরে এনে সমাধান করতে পেরেছি। এছাড়া, আমাদের এলাকার মধ্যে, রেশন ব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধাচরণের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করলে, অন্য আরও কিছু গণতান্ত্রিক সংগঠনের সাথে আমরাও তার মুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হই এবং পুলিশ পরে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই লক-ডাউন-র সবচেয়ে বড় শিকার, এই রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকরা অন্য সবার মতো আমাদের সদস্যদের সাথেও যোগাযোগ করেন। আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের কিছু কিছু অসুবিধা, যেমন রেশন বা হাতখরচ ইত্যাদির কিছুটা সুরাহা করতে সক্ষম হই। তাদের বাড়ি ফেরার ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় খবরাদি দিয়ে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া, অন্য প্রদেশ থেকে কিছু মানুষ কাজে এসে এখানে আটকা পড়ে যান এবং একসময় আর্থিক ও রেশনের অসুবিধার সম্মুখীন হন। অন্য কিছু সংগঠনের সাথে আমরা তাদের রেশন বাবদ ৩০০০/- টাকা দিয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করা হয়।

শ্রমিকের সর্বনাশ

রাজেন বাগ

অভিবাসী শ্রমিকের লং মার্চ চলছে। সেই সঙ্গে মৃত্যু-মিছিলও। সার্বিক ভাবেই শ্রমিকের অধিকার বিপন্ন মোদী সরকারের নীল নকশায়। ইতিমধ্যে গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, কর্নাটক-সহ বিজেপিশাসিত প্রায় সব রাজ্য এবং কংগ্রেস-শাসিত পঞ্জাব ও রাজস্থান শ্রম-আইনে মারাত্মক বদল এনেছে। দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টা করে দেওয়া হয়েছে (পঞ্জাব-রাজস্থানে অবশ্য বাড়তি ৪ ঘণ্টাকে ওভারটাইম ধরা হবে বলে জানানো হয়েছে)। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন পিএফে মালিকের জমার শতাংশ-হারও কমিয়ে দিয়ে শ্রমিকের সর্বনাশ আরও পাকা করেছেন। অজুহাত সব ক্ষেত্রেই করোনা-সঙ্কটের। ঘটনা হল, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই শ্রম-আইনে এই সব মারাত্মক বদলের নকশা তৈরি করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

লক-ডাউনের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যকে শ্রম-আইন সংশোধনে ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে গিয়েছে কেন্দ্রই। এমনকী অ-বিজেপি রাজ্য সরকারকেও দৈনিক শ্রম-সময় বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা করার জন্য এবং স্থায়ী চাকরির ধারণায় ইতি টেনে মেয়াদ-ভিত্তিক করার পরামর্শ যে কেন্দ্রই দিচ্ছে—তার প্রমাণ তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিবকে কেন্দ্রীয় শ্রমসচিব হীরালাল সামারিয়ার ৫ মে'র চিঠি (ডিও নং জেড-২০০২৫/৩৪/২০১৫-এলআরসি)। 'দৈনিক শ্রম-সময় ৮ থেকে বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা করা এবং মেয়াদ-ভিত্তিক নিয়োগপ্রথা চালু এখনই জরুরি' বলে নিদান দিয়ে রাজ্য কী করল—তার রিপোর্টও চেয়েছেন কেন্দ্রীয় শ্রমসচিব!

বস্তুত ২০১৪-র পর থেকেই মোদী সরকার শ্রম-সংস্কারের তাল ঠুকছে। শ্রমজীবী মানুষের বহু সংগ্রামে অর্জিত কিছু-কিছু অধিকারের আধার প্রধান ৪৪টি শ্রম আইন ৪টি কোডে সীমাবদ্ধ করার খসড়া দু'বছর আগেই তৈরি হয়। তার মধ্যে বেতন বিষয়ে কোডটি তো গত জুলাইয়ে আইনও হয়ে গিয়েছে প্রায় নিঃশব্দে। সেখানেই রয়ে গিয়েছে মস্ত বিপদ। ফ্লোর ওয়েজের নামে শিল্প-নিরপেক্ষ ভাবে ন্যূনতম দৈনিক মজুরি বাঁধা হয়েছে মাত্র ১৭৮ টাকায়। যেখানে বহু শিল্পে চালু দিনমজুরি তার দ্বিগুণ বা তারও বেশি। ব্যাপারটা স্থায়ী এবং সর্বব্যাপী করে তোলার পথ কেন্দ্রই করে রেখেছে গত বছর ওই ১৭৮ টাকার সংস্থানে কোড অন ওয়েজেস সংসদে পাশ করিয়ে। অথচ ১৯৯১ সালে র‍্যাপ্টাকস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানলে এখন কোনও শিল্পশ্রমিকের মাস মাইনেই ২৫ হাজার টাকার কম হওয়ার কথা নয়।

প্রস্তাবিত আর তিনটি—শিল্প-সম্পর্ক, সামাজিক সুরক্ষা এবং কাজের পরিবেশ ও শ্রম-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোডের বিল সংসদের আগামী অধিবেশনেই পেশ হয়ে যেতে পারে। শিল্প-সম্পর্ক কোডেই ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্টের কথা বলা হয়েছে—যার অর্থ স্থায়ী কাজের ধারণাটাই তামাদি হতে বসেছে। প্রতিবাদী আন্দোলনের পথ বন্ধ করতে ইউনিয়ন গঠন সংক্রান্ত বিধিও বদল করা হচ্ছে। ওই কোডেই শ্রম-সময় ৮ ঘণ্টার বদলে 'সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের ইচ্ছাধীন' করা হয়েছে। ওই অস্ত্রেই কয়েকটি রাজ্য ১২ ঘণ্টার শ্রম-সময় চালু করে ফেলল। মোদী সরকারের প্রস্তাবিত কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি-তেও শ্রমিকের সর্বনাশ। মালিকের স্বার্থ দেখতে গিয়ে ওই কোডে পিএফে মালিকের জমার পরিমাণ ১২ শতাংশের বদলে ১০ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে। যা আপাতত তিন মাসের জন্য বলবত করে দিল কেন্দ্র।

গত বছর জানুয়ারিতে ফাঁস হয়ে যাওয়া ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের রিপোর্ট দেখিয়েছিল—পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে ২০১৭-১৮-তে দেশে বেকারত্বের হার পৌঁছেছিল সর্বোচ্চ মাত্রায় (৬.১%)। করোনা-পরিস্থিতিতে লক-ডাউনের পর এপ্রিলের মাঝামাঝি সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমির রিপোর্টে প্রকাশ, বেকারত্বের হার সর্বকালীন রেকর্ড করেছে ২৬.১%-এ পৌঁছে। দেশের বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ ও তাঁদের পরিজনেদের এনে ফেলেছে খাদের কিনারে। লক-ডাউনে সরাসরি কর্মচ্যুত হয়েছেন প্রায় ১২ কোটি মানুষ। আরও ৮ কোটি লোক কাজের খোঁজে হন্যে। অথচ 'শ্রমিক কম পরিয়াছে'র ধুয়ো তুলে বিভিন্ন রাজ্য ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট বদলে দৈনিক সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টার শ্রম-সময় বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা করে দিল! শ্রম-আইনে স্থায়ী সংশোধন ঘটিয়ে সরাসরি অর্ডিন্যান্সের ভাবনাও রয়েছে কেন্দ্রের।

কবি ভারাভারা রাও আশঙ্কা জনক অবস্থায় মুম্বাইয়ের জে জে হসপিটালে ভর্তি। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।
অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি চাই।

ভাগলপুর-মুঙ্গেরের অতিথি শ্রমিকদের মণিদ্বীপ

জয়দেব দাস

হুগলী জেলার বলাগড় থানা এলাকার হাওড়া-কাটোয়া রেল শাখার খামারগাছী ষ্টেশনে বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের জেলা থেকে আগত ১৩১ জন মহিলা-পুরুষ অতিথি শ্রমিক প্রায় ১৭ দিন ধরে লক-ডাউনের ফলে আটকে ছিলেন। খবর পেয়ে এ পি ডি আর ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া শাখার সদস্যরা ১৩ মার্চ,২০২০ তথ্যানুসন্ধান করে।

অতিথি শ্রমিকরা ভাগলপুর-মুঙ্গের জেলা থেকে রওনা দেন ২১ মার্চ। ২২ মার্চ খামারগাছীতে পৌছে ২৩ মার্চ থেকে কাজ শুরু করেন। চার থেকে পাঁচ দিন তারা কাজ করেন। লক-ডাউন শুরু হলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে তাঁরা খামারগাছী প্লাটফর্মে চলে আসেন। আমরা ১৩ মার্চ দুপুরে খামারগাছি ষ্টেশনে গিয়ে দেখতে পাই, সারা প্লাটফর্ম জুড়ে কৃষি শ্রমিকরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ কেউ আছেন ষ্টেশন সংলগ্ন মাঠে। প্লাটফর্মের ওভার ব্রীজের ছায়ায় বসে ছিলেন অনেকে। মার্চের দাবাদহ-রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে খামারগাছী প্লাটফর্মই তাদের ঘর বাড়ী। তাঁরা আছেন মোট ১৩১ জন। ২৫ মার্চের পর থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত মাত্র দুদিন কাছাকাছি কোন ক্লাব-সংগঠণ খাবার দিতে এসেছিল। বিষন্নমুখে তাঁরা জানিয়েছেন, সে খাওয়ারও অপর্যাপ্ত। ১২ মার্চ বলাগড় বি ডি ও সমেত প্রশাসনের কর্তারা তাদের দেখে যান সঙ্গে দু'কিলো করে প্রতি পরিবারে চাল দিয়ে যান। শুধুমাত্র চালই। মাঝের দিনগুলিতে তারা যৎ সামান্য যে টাকা-পয়সা ছিল তা দিয়ে মুড়ি ছাতু খেয়ে-না-খেয়ে দিন কাটিয়েছে। সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় খবর পাওয়া যায়, রেল দপ্তর আর পি এফ দিয়ে শ্রমিকদের প্লাটফর্ম থেকে বের করে দেয়। এরপর বলাগড় ব্লক প্রশাসন শ্রমিকদের খামারগাছী, কামালপুর হাই স্কুলে জায়গা করে দেয়।

হুগলী জেলা এ পি ডি আর এর আলোচনা, অন্য শাখার সদস্যদের সর্বাত্মক আর্থিক সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের উদার আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাসে কামালপুর হাই স্কুলে শ্রমিকদের কাছে পৌছাই। স্কুল সংলগ্ন বেশ কিছু যুবক, স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি ও সহ সম্পাদক আমাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে, যদি আমরা দায়িত্ব নিয়ে কিছুদিন শ্রমিকদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি তবে ওরা সাহস পায়। এ পি ডি আর আশ্বস্ত করে দশ থেকে বারো দিন শ্রমিকদের খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারবে। বলাগড় ব্লক অফিসে বিডিও বলেন, 'আপনারা কিছুদিন চালিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়'। ১৫ মার্চ থেকে শ্রমিকদের আপ্যয়ণের একটা ব্যবস্থা আমরা শুরু করতে পেরেছিলাম। স্কুলের পরিকাঠামো ব্যবহার করে আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে অতিথি শ্রমিকদের যথাযথ মর্যদা-সম্মান দেওয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। মহিলা অতিথিদের পরিধানের বস্ত্র সমস্যা দেখা দেওয়া এ পি ডি আর-এর জনৈক শুভানুধ্যায়ীর আন্তরিক উদ্যোগে তিপান্ন জন মহিলাকে একটি করে ণতুন শাড়ি দেওয়া হয়। স্কুল সংলগ্ন যুবকরা এবং সভাপতি-সহ সম্পাদক আপ্যায়ণের ব্যবস্থা সুচারু রূপে গড়ে দেওয়ার জন্য এ পি ডি আর-কে বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এ পি ডি আর এবং শুভানুধ্যায়ীদের উদ্যোগে বারোদিন অতিথিদের আপ্যায়ণ যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে করা হয়েছে। স্কুল সংলগ্ন দশ জন দুস্থ অতিথি এবং রান্না থেকে পরিবেশণ সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজে ঐকান্তিক সহযোগী পনের জন সমেত প্রায় এক'শ বাষ্টটি জন অতিথির খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

বাকী উনিশ দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে কোন কোন সংগঠন এবেলা-ওবেলা করে সাত থেকে আট দিন শ্রমিকদের খাওনোর দায়েত্ব নিয়েছিল। বাকী দিন বলাগড় বিডিও'র পক্ষ থেকে ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। বত্রিশ দিন তাঁরা কামালপুর হাই স্কুলে ছিলেন। কামালপুর স্কুল সংলগ্ন প্রায় কুড়ি জন যুবক এবং স্কুলের সভাপতি এবং সহ-সম্পাদক 'দূরত্ব বিধি'কে সামলে ১৩ মার্চ থেকে জড়িয়ে ছিল শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁরা না-থাকলে কোন পর্যায়ে এই কার্যক্রম চালানো যেত না।

আর একটি কাজ আমরা করেছিলাম। ঘরে ছেড়ে আসা ছোট ছোট শিশু, বৃদ্ধ 'ঘরওয়ালে', পিতা মাতা কোথায় খাচ্ছে, কোথায় ঘুমোচ্ছে এই দুশ্চিন্তা থেকে বিষন্ন শ্রমিকদের কিছুটা সময় বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিলাম। কয়েকদিন সন্ধ্যেবেলায় গানের আসর বসিয়েছিলাম মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে। শিব বন্দনা, চৈতি এবং সাদির(বিবাহের) গান ওঁরা গেয়েছিলেন। তাঁদের সিনেমাও দেখানো হয়েছিল।

বলাগড় অঞ্চলে যে শ্রমিকরা আসেন; স্ব-বাস থেকে পরবাসে যাওয়া অন্য শ্রমিকদের থেকে ভিন্ন ধরণের এক বৈশিষ্ট আছেতাদের। অতিথি এই শ্রমিকরা কৃষি সমৃদ্ধ বলাগড় ব্লকে আসেন মূলত পেঁয়াজ তুলতে। বলাগড়ের 'সুখসাগর' পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমান, সুখ্যাতি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। একজন কৃষকের উৎপন্ন ফসলের ভিতর বীজ বপণ থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত কত ধরণের শ্রম, ফসল থেকে জীবন ধারণের রসদ সংগ্রহের জন্য কত ধরণের উপায় ঢুকে থাকে রাষ্ট্র কোনদিন জানার চেষ্টা করে নাই।

পেঁয়াজ তোলার সময় হলে ভাগলপুর ও মুঙ্গের শহর থেকে কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার বৃত্তের মধ্যকার গ্রাম থেকে এই শ্রমিকরা বলাগড় অঞ্চলে আসেন। পেঁয়াজ তুলে শ্রমিকরা

টাকার মূল্যে মজুরী পান না। পেঁয়াজের বিনিময়ে তাঁরা কৃষকের জমি থেকে পেঁয়াজ তুলে বস্তা বন্দি করে দেন। কুড়ি-পঁচিশ জনের দলবদ্ধ শ্রমিকরা এক বিঘা জমির পেঁয়াজ তুলে এক বস্তা পেঁয়াজ পায়। এই পেঁয়াজ তারা বিক্রি করেন না। বাড়িতে নিয়ে যান। ভাগলপুর, মুঙ্গের-এর স্ব-দেশে। সম্বৎসর তাঁরা এই পেঁয়াজ খেয়ে থাকেন। তাঁদের দেশে পেঁয়াজের মূল্য চড়া। সেই দামে ক্রয় করে খাওয়ার মত রোজগারের উপায় তাদের নেই। তাঁদের শরীর আছে, শক্তিও আছে। তাঁদের দুই হাতে কেবল কাজ নাই! পরিবারের খাদ্যে স্বাদ আস্বাদনের জন্যই তারা পরিবার ধরে আসেন, এই পরবাসে। সবাই মিলে পেঁয়াজ কুড়িয়ে, সবাই মিলে খাবেন। এই শ্রমিকরা আসেন মাত্র পাঁচ থেকে সাত দিনের জন্য। প্রায় সকলে এক কাপড়েই আসেন। মাত্র তো এই কটা দিন! দু-তিন বস্তা পেঁয়াজ হলেই দেশে চলে যান। ট্রেনে প্রায় সকলে বিনা টিকিটের যাত্রী। এমনি করেই চলেন তাঁরা। এটাই তাঁদের জীবনের ছবি। ঠিক এই কারণেই মহিলাদের পরিধানের শাড়ীর ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছিল।

স্বামী-স্ত্রী এসেছে। তিন থেকে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে ভাগলপুরের গ্রামে রেখে এসেছেন। স্ত্রী এসেছেন খামারগাছী; স্বামী মুম্বাই অথবা দিল্লী কিংবা ব্যাঙ্গালোরে, মুঙ্গেরের দেশে চার ছেলে-মেয়েকে একটু বড় মেয়ের হেপাজতে রেখে এসেছেন। বৃদ্ধা এসেছেন দুই ছেলেকে নিয়ে। বৃদ্ধ 'ঘরওয়ালে' একলা ভাগলপুরের দেশে। এক বৃদ্ধা এমনই এক 'ঘরওয়ালের' জন্য কোথায় তিনি খাচ্ছেন, কোথায় শুচ্ছেন এই চিন্তায় দিনের পর দিন যেভাবে উথালি-পাথালি কেঁদেছেন তা দেখে আমাদের বুক মুচরে উঠেছে। হিন্দিতে বৃদ্ধা বলছেন, আমার বুড়া'র 'তসবির' আমার চোখে দিনে দিন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আমি ঘর যাবো। বস্তা বেঁধে, পরিচ্ছন্ন শাড়ি,কপালে উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপে সেঁজে গেটের বাইরে বেড়িয়ে এসেছেন। এক মহিলা শ্রমিক বলেছেন, আপনাদের এই ভালো ভালো খাবার খেয়ে 'পঁচ'তা নেহি' আমার পেট ফুলে উঠছে। কারন, আমার তিন জন ছোট ছোট সন্তান কী খাচ্ছে, কোথায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, আমি জানিনা। আমার দেখতে ইচ্ছে করছে তাদের। যে বাৎসল্য রসের ধারা বয়ে যেত সন্তানদের স্পর্শে। সে ধারা অবরুদ্ধ। আশঙ্কার এই বেদনা মায়ের মনে বিক্ষোভ তৈরী হচ্ছে। সংক্ষোভ বে'র না হতে পারায় আবসাদে বিষন্ন হয়ে ভেঙে পরছেন মা। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি হেঁটে হেঁটে মুঙ্গের চলে যাবো। মুঙ্গের তক? 'হ্যা'।। 'মুঙ্গের তক'। যে পড়শীর কাছে তাদের রেখে এসেছে তাদের কাছে ফোন করলে 'মেরে বাচ্চে' কেবল কাঁদছে আর কাঁদছে। তাঁর অসহায় আর্তি, আপনাদের পায়ে ধরছি আমদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। ভগবান আপনাদের ভালো করবে, ভগবান আপনাদের অনেক টাকা দেবেন। 'দো-দিন দেখেঙ্গে উসকে বাদ গেট তোড়কে নিকাল যায়েঙ্গে।'

সামনে অকূল জলধি তপ্ত পিচের কালো পথ। বাঙলার খামারগাছী থেকে সুদূর মুঙ্গেরের গ্রাম পর্যন্ত সে পথ বিস্তৃত। শুধু সন্তান, শুধু পরিজন কেন! তাঁর বুকের মধ্যে ধরা আছে মুঙ্গেরের টিলা-পাহাড়, মুঙ্গেরের গঙ্গা, আবাদি-আনাবাদি ক্ষেত, পরিচিত গাছপালা। বৃষ্টি হোক আর না হোক শুষ্ক হোক, সজল হোক সে মুঙ্গের তাঁর, মুঙ্গেরের সে। অবচ্ছিন্ন সে সত্ত্বা। তাকে বিচ্ছিন্ন করবে কে! 'করোনা'! ত্রিশুল-তরবারী! সে শক্তি কোথায়! হেঁটে চলেছে আসমুদ্র-হিমালয়ের পরবাসী মানুষের দল। কী নিদারুণ পরিহাস! নিজ দেশে পরবাসী সে! এই মানুষরা নেতা-মন্ত্রী-আমলা কারো কোন কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না। ঠেকে ঠেকে জীবন তাঁদের দূর্বিসহ হয়ে উঠেছে। বাস হোক, ট্রেন হোক তার নিয়ন্ত্রণ মালিকের হাতে, সরকারের হাতে। কিন্তু নিজের দুই পদযুগল তার মর্জিতেই সোজা হয়, ভাঁজ হয়, চলতে শুরু করে। হয়তো তাঁর তীব্র ক্ষুদা আছে, রোজগারের অভাবে, অর্থের অভাবে, জীবনের ছন্দ তাঁর কেঁটে যাবে। সব-তো এ পোড়া দেহের জন্য। বেপরোয়া শ্রমিক সব ঠেলে ফেলেছে। শ্রমিকের মনের আকাশে নিবিড় করে জড়িয়ে আছে তার বাবা, তাঁর মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, মুঙ্গেরের আকাশ বাতাস। এই সম্পর্কের শক্তির কাছে অন্য সব শক্তি পিছনে চলে যায়। সেই পেঁয়াজ তোলা মহিলা শ্রমিকের মণিদ্বীপ রয়েছে সম্পর্কের মধ্যে; মুঙ্গেরের পাহাড়ের কোলে মাহাতোদের গ্রামে। তাই সারা ভারতের তাঁর যত প্রাণের সাথী আছে সবাই কালো রাস্তার আথৈ সমুদ্রে পাড়ি দিতে নেমেছে তাদের মণিদ্বীপ-এর কাছে পৌছোবে বলে। সে কথা শুনতে পেয়েছে খামারগাছীতে পেঁয়াজ কুড়োতে আসা মহিলা-পুরুষ। দল বেঁধে। একা। চলে যেতে চাইছে। একজন যুবক বলে ছিল, বাবু, 'কুছ রাস্তা হাম দৌড়কে যায়েঙ্গে, কুছ পয়দল।'

সত্যিই ভেঙে ফেললো কামালপুর হাই স্কুলের গেট। মে মাসের আট তারিখ সকাল নয়টা নাগাদ স্কুলের গেট ভেঙে বস্তায় বাধা সংসার মাথায় নিয়ে বেড়িয়েই পরলো সবাই। আর থাকবে না তাঁরা। হেঁটে চলে যাবে মুঙ্গের-ভাগলপুরে। বলাগড় থানার পুলিশ ও বিডিও সমেত প্রশাসনের দলবল ভয় দেখিয়ে তাদের আবার স্কুলের ভিতর প্রবেশ করায়। সেদিন বেপরোয়া শ্রমিকদের প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় ; এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোন উপায়ে তাদের ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে পৌছনোর ব্যবস্থা করবে।

আমাদের চেষ্টাও তো নিস্ফল হচ্ছে। সরকার এই অসহয়াতাকে পা'মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, শ্রমিকদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছি না। স্তব্ধ হয়ে আচ্ছি, কিছু করতে পারছি না। মার্চ মাসের চৌদ্দ তারিখ থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলাম। বিডিও মহাশয় সহযোগিতাই করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসণ এর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ 'করোনা'কে কেন্দ্র করে শ্রমিকের বিপক্ষেই গেছে।

প্রথম দিন থেকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম জণগণের সমস্ত প্রকার দায় সরকার গ্রহণ করুক। কিন্তু সরকারের বিবৃতি থেকে পরিস্কার হচ্ছিল, জনগণ দিয়ে কাজ করিয়ে সরকার রোগের এই বিপর্যয় থেকে উত্তীর্ণ হতে চাইছে।। এনজিও দের সহযোগিতা করতে বলেছে। সরকারই যেন বলছে, আপনারা দরিদ্রনারায়ণ সেবা দিন। শ্রমিকদের আপ্যায়ণের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাদের

যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বারবার প্রক্রিয়া চালানোর কথা বলেছি। একদিন আন্তর এক দিন জেলা স্তরের প্রশাসণ বিডিও, এডিএমদের সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করেও কিছু করতে পারি নি। একটা সময়ের পর আমরা বুঝতে পেরেছি, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী হ্যা না-করলে কোন প্রক্রিয়াই কাজ করবে না।

এত কিছু বুঝেও মানুষকে বোঝাতে-শোনাতে যেতে পারছি না। সেখানে 'দূরত্বের' গেরো আমদের বেঁধেও ফেলেছে। সভা-সমাবেশ বন্ধ। মিটিং-মিছিল বন্ধ। জীবন বাঁচাতে যে অধিকারগুলো আমাদের অনিবার্য্য সে গুলি থেকে জনগণকে বিযুক্ত করে দেওয় হল। এ দেশে পদাঘাতই আমাদের সম্বল। সম্ভাষণ যদি জনগণ পেত তবে তো মিটিং-মিছিলের আর কী দরকার ছিল! জনগণ চাল পাচ্ছে, টাকা পাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী- মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক ক্ষমতার দড়িতে বাঁধা পরে যাচ্ছে। একটি রোগ, একটি 'বিপর্যয় মোকাবিলার আইন' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চুরমার করে দু'টি হাতের থাবার মধ্যে চলে যাওয়ার মুখোমুখি আমরা। একটি রোগকে হারিয়ে, জীবন বাঁচানোর নাম করে বেঁধে ফেললো আমাদের জীবনকে।

"গেট তোড়কে নিকাল যায়েঙ্গে" মে মাসের আট তারিখের সত্যিই যখন হলো, তারপরই প্রশাসণ বোধহয় নড়েচড়ে বসেছিল। এ ঘটনা কী ইঙ্গিত দিল, কে জানে! জগদ্দল নড়ে উঠলো। চৌদ্দই মে, শ্রমিকদের মেডিকেল চেকআপ হল। পনেরোই মে সকাল আট'টায় পাঁচটি লোকাল বাসে চেপে সাড়ে দশটায় সিঙ্গুরে উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো খামারগাছীর কামালপুর হাই স্কুল থেকে। সেখান থেকে দশটি সরকারি বাসে চেপে আরও কিছু শ্রমিকের সঙ্গে চলে যাবে এ পরবাস ছেড়ে বিহারের স্ব-বাস ভাগলপুর-মুঙ্গেরের গ্রামে। অতিথি এক'শ একত্রিশ জন পেঁয়াজ-শ্রমিক। যাঁরা এসেছিল পাঁচ থেকে সাত দিনের জন্য এক কাপড়ে, রয়ে গেল অনন্ত প্রহরে মোড়া দীর্ঘ ছাপান্নটি দিন। তাঁরা গেল, শ্রমিকের মণিদ্বীপে। যেখানে জীবনের সম্পর্কগুলো সার হয়ে রয়ে গেছে। ভাগলপুর, মুঙ্গেরের পাহাড়ের কোলে মাহাতোদের গ্রামে।

প্রেস বিবৃতি

Association for Protection of Democratic Rights

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি

Eternal Vigilance is the Price of Liberty

18 Madan Baral Lane , Kolkata- 700 012
Website: www.apdrwb.in Email: apdr.wb@gmail.co
Contact: +91-9432276415/ +91-8981416511

প্রেস-বিবৃতি

কলকাতাঃ শনিবার, ২১শে মার্চ, ২০২০

দমদম সেন্টাল জেলের আজকে বন্দি ও জেল-কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালনার অতি উদ্বেগজনক ও নিন্দাজনক ঘটনাবলীর জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হব। ঘটনার পুলিশী ব্যাখ্যা নয়, চাই পূরণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত।

করোনা ভাইরাস জনিত উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সরকার তদের ঠাসঠাসি অবস্থায় থাকতে এখনও বাধ্য করছে, মুক্তি দিচ্ছেনা; আদালতও বন্ধ। বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হঠাৎই বন্ধ করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। এমত অবস্থায় বন্দিদের ক্ষোভ স্বাভাবিক যাকে বুঝতে ব্যর্থ কারা-প্রশাসন। তাদের অমানবিক চরিত্রের বহু প্রতিফলন প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে। সম্প্রতি বারুইপুরে সংশোধনাগারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। দমদম জেলর অভ্যন্তরিণ পরিস্থিতিও বহুদিন যাবৎই খারাপ; সেখনে জল সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ এবং যথারীতি সে অভিযোগর বাস্তবতা স্বীকারও করেনি।রাজবন্দদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার নৈমিত্তিক ঘটনা সেখানে।

এপিডিআর আজকের ঘটনায় পুলিশ ও আরএএফ-র ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছে এবং সরকারের কাছে বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানাচ্ছে। এপিডিআর আশা করে সরকার এই দাবীর যৌক্তকতা মেনে কাজটি করবেন।

ধীরাজ সেনগুপ্ত